বাবুইএর অ্যাড্‌ভেঞ্চার

কার্ত্তিক, ১৩৫০

সেদিন আমাদের পাশের বাড়িতে মস্ত এক বিয়ের ধুম গেল। আমাদের এ দু'বাড়ির মধ্যে বহুকালের পরিচয়। আমাদের বাড়িতে কাজ পড়লে ওরা নিজেদের লোকের মত এসে খেটে দিয়ে যায়, আমরাও ওদের বেলা তাই করি। খুব ধুম করে বিয়ে হল কিনা, তাই একটা বাড়িতে কুলোয়নি; আমাদের গাড়িটাও ওরা চেয়ে নিয়েছিল। ওদের বাড়িতে বিয়ের আসর হয়েছিল, আর আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত।

প্রথম পালা যখন খাওয়া হয়ে গেছে, আমি দৌড়ে পান নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ছাদে একটা গোলমাল শুনলুম। গিয়ে দেখি আমাদের মেসোমশাই একজন বে-নেমন্তন্নি লোক ধরেছেন—একটি ষোলো বছরের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে, দেখে বোঝবারই যো নেই যে সে এমন চুরি করে খেতে এসেছে।

তার একটা কান লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, বুঝলুম সেটা মেসোমশাই-এর আশীর্ব্বাদ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই

যে ছেলেটির মুখের ভাব দেখে বোঝবার যো নেই যে সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়েছে। আচ্ছা বেহায়া ছেলে তো! আমি ভাবলুম মার-ধোরে কিছু হবে না—একে একটু শিক্ষা দিতে হবে। এই ভেবে ভীড় ঠেলে গিয়ে আমি বল্লুম—"মেসোমশাই, একে আমার কাছে ছেড়ে দিন। আমি এর ব্যবস্থা করছি।" বলে ছেলেটিকে সঙ্গে করে আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

খাটের উপর তাকে বসতে বলে সোজাসুজিভাবে জিজ্ঞেস করলুম—"তুমি কি বাড়িতে খেতে পাও না? এখানে খেতে এসেছিলে কেন?"

ছেলেটি হাসতে হাসতে বল্লে—"সে আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

আমি বল্লুম—"কেন? বুঝতে পারব না কেন?"

ছেলেটি বল্লে—"দেখুন, আমি যে ধরা পড়েছি, সে আমি ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছি বলে, তা নইলে এই ভদ্র-বেশ পরা আমাকে হঠাৎ চোর বলে ধরতে আপনাদের সাহসই হত না।"

আমি বল্লুম—"কখ্খনো নয়। মেসোমশাই তোমার মত অমন ঢের লোককে ধরেছেন। এই কাজ করে করে তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন—আর তুমি তাঁর চোখে ফাঁকি দিয়ে পালাবে?"

ছেলেটি বল্লে—"বিশ্বাস না হয়, সেই টাক-মাথা-

ওয়ালা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করুন ;—ঐ যে যিনি ত-ত-ত-ত করে কথা বলেন—"

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি রাধাবিনোদ বাবু।"

ছেলেটি বল্লে—"সেই রাধাবিনোদ বাবুর পাশে বসে আমি খাচ্ছিলুম। আপনার মেসোমশাই বহুবার আমাদের পংক্তির সামনে দিয়ে চলে গেলেন, আমাকে দু'বার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করে গেলেন যে আমার আর কি চাই ; কিন্তু কোন মতেই আমায় চোর বলে ধরতে পারলেন না। আমি দেখলুম, তবে তো সব মাটি হয়। খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে আমি রাধাবিনোদ বাবুকে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লুম,—হাঁ মশাই, বরের নামটি কি ? তিনি বলতে আমি বল্লুম,—কনের নাম ? রাধাবিনোদ বাবু অবাক হয়ে বল্লেন,—সেকি, তুমি বরকন্যা কারুরই নাম জানো না, তবে কার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছ ? আমি যেন হঠাৎ ভারি ভয় পেয়েছি এই ভাব দেখিয়ে বল্লুম,—মাপ করবেন, খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গেছে, এখন কোন রকমে···। রাধাবিনোদ বাবু কেমন ঘাবড়ে গেলেন। চুপিচুপি গিয়ে আপনার মেসোমশাইএর কাছে বলে দিলেন। তারপর কি হয়েছে আপনি তো দেখেছেন।"

আমি বল্লুম—"ধরা পড়ে অনেকেই অনেক রকম কথা বলে। আমি তোমায় সহজে ছাড়চিনে। তোমার

নাম, তোমার ঠিকানা কি তাই বল। আমি সব খোঁজ চাই।"

ছেলেটি তার নাম, তার বাবার নাম, তার বাড়ির ঠিকানা সব বলে গেল। বল্লে—"বিশ্বাস না হয় খোঁজ করে দেখতে পারেন, আমাদের বাড়িতেও যথেষ্ট খাবার জিনিস তৈরী হয়। আপনাদের এখানে হ্যাংলার মত আমি আসিনি।"

আমি বল্লুম—"তবে তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছ ?"

সে বল্লে "অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে।"

আমি বল্লুম—"তার মানে ? কান মলা খাওয়া তোমার অ্যাড্‌ভেঞ্চার নাকি ?"

সে বল্লে—"নয় ? এই তো মজা। সখ করে চুরি করলুম, ইচ্ছে করে ধরা দিলুম লোকে সত্যিকারের চোর ভেবে ভুল করলে; এ কি একটা কম অ্যাড্‌ভেঞ্চার ?"

আমি ভাবলুম ছেলেটার মাথায় কিছু গোল আছে। বল্লুম – "চল, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চল।"

তাদের বাড়িতে পৌঁছে নীচে বসবার ঘরে ঢুকলুম। সেখানে তার বাবা বসেছিলেন. তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতে তাঁকে ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বল্লুম।

প্রথমটা তিনি ভাল রকম বুঝতে পারলেন না। তারপর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথাটা বলতেই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে তাঁর ছেলেকে কাছে

ডেকে বল্লেন—"ছি: বাবুই, অচেনা ভদ্রলোকদের এমন ব্যস্ত করা তোমার ভারি অন্যায়।" তারপর আমায় বল্লেন—"ওকে আপনি চেনেন না—ওর ঐ অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা এক বাতিক। ছেলেবেলা থেকে এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমরা আর পারলুম না।"

আমার শুনে ভারি আশ্চর্য্য লাগল। বাবুইএর সঙ্গে ভাব করে ফেল্লুম। সেই থেকে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। বাবুইএর ছেলেবেলাকার নানা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প সে আমার কাছে করেছে। তা যেমন আশ্চর্য্য তেমনি মজার। তারই মুখ থেকে এক এক করে তার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী এইবার তোমরা শোনো।

প্রথম অ্যাডভেঞ্চার

শনিবারের ছুটি হয়ে গেছে। বাড়ীর ছাদে পাঁচিলের ছাওয়ায় একলা বসে বসে কত কি ভাবছিলুম। তখন বৈশাখ মাস, সারা ছাদ রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে। আগুন হাওয়ায় গা মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। গাছ-পালা, কাক-পক্ষী পর্যান্ত সব নিঝ্ঝুম। কিন্তু আমার কোন খেয়াল নেই। হাতে বাংলা খবরের কাগজ "অদ্ভুত তত্ত্ব" নিয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম। এই খবরের কাগজটি আমার রোজই কিনে পড়া চাই—একদিনও বাদ গেলে চলেনা। বাবা বলতেন – "হ্যাঁ রে, পৃথিবীতে এত বই থাকতে তোর ঐ কাগজটার উপরই এত ঝোঁক কেন ?" আমি বলতুম—"এতে যেমন মজার মজার খবর বার হয়, অন্য কোন কাগজে তা পাবার যো নেই।" কে উত্তর-মেরুতে যাত্রা করেছে, কে মরুভূমি পার হচ্ছে, কারা প্রশান্ত মহাসাগরে সাঁতার দিচ্ছে এই সব আজগুবি খবর পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। আমার মনে হত আমিই বা কবে এমন আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়ে আমারই মতো পাঠকদের তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবো ?

খবরের কাগজে এই মাত্র পড়েছি কোন সাহেবরা যেন হিমালয় পর্ব্বতের চূড়োয় উঠতে গেছেন। মনে-মনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠছিলুম! নিজের মনেই একবার বলে উঠলুম—"একটা কিছু অ্যাড্‌ভেঞ্চার না করলে আর চলছেনা দেখছি!"

একটা লাল ঘুড়ি আমার মাথার কাছে ফরর্‌ ফরর্‌ করে উড়ছিল। মনে মনে মতলব আঁটছিলুম—আমি একটা প্রকাণ্ড ঘুড়ি তৈরী করবো। ঘুড়ি করে তাতে মোটা দড়ি বেঁধে উড়িয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়বো। তারপর ঘুড়ি আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যায়। এই ফন্দিটা মাথায় আসছিল এমন সময় শুনতে পেলুম ছাদের কোনে কিচ্‌ করে একটা আওয়াজ।

চেয়ে দেখি একটা ছোট্ট বাঁদরের ছানা সামনের দেবদারু গাছ থেকে লাফিয়ে আমাদের ছাদের পাঁচিলের উপর বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার মনে হল—ঠিক হয়েছে। এই বাঁদরটাকে ধরে পোষ মানিয়ে আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গী করে নিতে হবে। এই না ভেবে আমি দৌড়ে নীচে ছুটলুম, একটা চাদর নিয়ে আসবার জন্যে—যাতে করে বাঁদরটাকে চাপা দিয়ে ধরতে পারা যায়। বারান্দায় একটা বিছানার চাদর শুকোচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা টেনে নিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখলুম বাঁদরের বাচ্ছাটা কি একটা হাতে নিয়ে

আমাদের কলতলার চৌবাচ্চার উপর বসে রয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি—ওমা, তার বগলে একটা বিস্কুটের বাক্স। আমার মনে হঠাৎ ভারি আনন্দ হল। ঐ বিস্কুটের টিনটার উপর আমার অনেকদিন থেকে ভারি লোভ। কিন্তু বাবা যে ওটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখতেন কোনমতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে বাবা ঐ বাক্স থেকে একটু করে বিস্কুট ভেঙে আমাকে খেতে দিতেন। সে বিস্কুট এত চমৎকার ছিল যে ঐটুকুতে আমার লোভ আরো বেড়েই যেতো। কিন্তু বাবা চলে গেলে হাজার খুঁজেও বাক্সটা কিছুতেই আমি বার করতে পারতুম না। আজ সেই বাক্সটাই আমার সঙ্গী বাঁদর কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছে দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলুম।

এক লাফে বিস্কুট-সমেত বাঁদরটাকে ধরবার জন্যে আমি ছুটে গেলুম। বাঁদরের বাচ্ছাটা পাঁচিল টপকে পিঠটান দিলে—কিন্তু পালাবার সময় বেচারার হাত থেকে বিস্কুটের টিনটা কলতলার শানের উপর পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সেটাকে আমি আত্মসাৎ করলুম; একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলুম বাড়ীর কেউ দেখতে পেলেন কি না—তারপরই বিস্কুটের বাক্সটাকে চাদরে বেশ করে জড়িয়ে ধীর গতিতে বাড়ীর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে

দাঁড়ালুম। বাঁদরটাকে একবার খুঁজলুম বটে—কিন্তু তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

মনে হল--রাস্তায় যখন বেরিয়েই পড়েছি তখন অ্যাড্ভেঞ্চার-ই সুরু করে দেওয়া যাক্, আর দেরী নয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম আমার জন্মদিনে পাওয়া দশ টাকার নোটটা রয়েছে। রাস্তা ধরে হন্ হন্ করে এক দিকে চলা সুরু করে দিলুম। তখন আমাদের বাড়ীর সকলে ঘর দোর বন্ধ করে শুয়ে আছেন, কাজেই কেউ আমাকে দেখতে পেলেন না।

চলতে-চলতে ভাবতে লাগলুম—কোথায় যাওয়া যায়? একবার রাঁচিতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলুম রাত্তির বেলা টাটানগর স্টেশানে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে দেখেছিলুম দূরের আকাশটা যেন আগুনের হলকায় টক্টকে লাল হয়ে রয়েছে আর মাটির উপর হাজার হাজার ইলেক্ট্রিকের আলো। বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলুম- ও আলোগুলো কিসের বাবা? বাবা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন—আমার কথার জবাব দেননি। আমি ভেবেছিলুম যখন বড় হব, একবার টাটানগরে গিয়ে ঐ আলোর রাজাটা দেখে আসব। রাঁচিতে পৌঁছেও আমার মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যেত, মনে হত— দূর, এ আবার একটা দেশ। এর চেয়ে টাটানগরের

ঐ আলোর রাজ্যটায় যেতে পারলে অনেক মজা হত।

আজ সেই টাটানগরের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে আমি ঠিক করে ফেললুম ঐখানেই যেতে হবে।

ষ্টেশানে পৌঁছে আমি দেখলুম চারিদিকে ভিড়, গোলমাল, কুলিমজুরের ছুটোছুটি এইসব ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে একটা টাইমটেব্‌ল্‌ কিনে নিলুম। অনেক খুঁজেপেতে লোকজনের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে টাটানগরের গাড়ী কখন ছাড়ে সেটা বার করে ফেল্লুম। গাড়ী ছাড়তে তখনও দেড় ঘণ্টা দেরী। আমি টিকিট কিনে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলুম।

এই দেড় ঘণ্টা কি করে কাটানো যায়? বিস্কুটের বাক্সটা খুলে ফেল্লুম। একে হাতে কোন কাজ নেই—তার উপর আমার অতদিনকার আশা করা অমন লোভনীয় বিস্কুট—একটার পর একটা আমার মুখে উঠতে লাগল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সব বিস্কুট শেষ হয়ে গেল। কল থেকে এক পেট জল খেয়ে বিস্কুটের বাক্সটা চাদরে মুড়ে পুঁটলী করে গাড়ীতে গিয়ে চড়ে বসলুম। গাড়ী ছেড়ে দিলে।

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে সহরের দৃশ্য মুছে গেল। দুদিকে মাঠ আর গ্রামের সারি দেখে মনে

হতে লাগল স্বেন্ হেডিন কি কলম্বাসের মতো সত্যিই আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছি।

ভোর চারটের সময় টাটানগরে পৌঁছবার কথা। ভোরে উঠতে হবে, কাজেই আমার পুটলীটা বালিস করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লুম।

ভোর বেলা চোখ মেলে দেখলুম গাড়ী টাটানগরে হাজির। আলস্যটা তখন বেশ জমে এসেছে, উঠতে ইচ্ছে করছিল না—কিন্তু কি করব? নামলুম।

ষ্টেশানটা তখনো অন্ধকার-অন্ধকার—মিটমিটে বাতিগুলো তখনও নিভিয়ে দেয়নি। সামনের মাঠের উপর ঝোপগুলো কালো মেঘের টুকরোর মতো পড়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে এইসব দেখতে দেখতে ক্রমে ক্রমে মাঠের উপরকার অন্ধকার মুছে গেল। একটা খবরের কাগজওয়ালা সুর করে হাঁক দিতে দিতে ষ্টেশানে ঢুকল। আমি আমার প্রিয় কাগজ "আজবতত্ত্ব" কিনে নিয়ে পড়তে বসে গেলুম। পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল একটা জায়গায়—সেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"পুরস্কার ঘোষণা!

আমরা অবগত আছি যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি 'মিল্টন্' যে বাক্সে তাঁহার রচনাগুলি যত্ন করিয়া রাখিতেন সেই বাক্সটি কালক্রমে ডাব্‌লিউ ডিক্সন্ বিস্কুট কোংএর

কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। খোঁজ লইয়া জানিলাম ঐ বাক্স উক্ত কোম্পানী দ্বারা "মিক্‌স্‌ড্‌" বিস্কুটে পূর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং ঐ বাক্সের নম্বর ৩০৩। যদি কোন দোকানে বা কোন ব্যক্তির নিকট ঐ নম্বরের ডাবলিউ ডিক্সনের মিক্‌স্‌ড্‌ বিস্কুটের বাক্স থাকে, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় উহা লইয়া যাইলে নগদ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পাইবেন।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল

আজব-তত্ত্ব আফিস

৭১।১ সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা।"

তাড়াতাড়ি আমার পুঁটলিটা খুলে বিস্কুটের টিন বার করে দেখলুম সেটা W. Dickson Co.র Mixed বিস্কুটের বাক্সই বটে। আর কি আশ্চর্য্য! তার নম্বরও ঐ ৩০৩। অ্যাঁ! আমারই কপালে পাঁচ পাঁচশো টাকা! বাঁদরের বাচ্ছাটা কেমন করে আমাকে বিস্কুটের বাক্সটা এনে দিয়েছে তাই ভেবে মনে মনে তার বাঁদুরে বুদ্ধির প্রশংসা করে উঠলুম। আর দেরী করলুম না, তাড়াতাড়ি টাইমটেব্‌ল্‌ খুলে দেখলুম এক ঘণ্টা পরে একটা কলকাতার গাড়ী আছে।

কলকাতায় এসে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে সাতটা। সেণ্ট্রাল এভেনিউটা খুঁজে নিয়ে ৭১।১ এর খোঁজে হন্‌ হন্‌ করে চল্লুম।



সেখানে পেঁাছে দেখি একটা দোতালা বাড়ি। টাইম টেব্‌ল্‌টা চাদরে জড়িয়ে হাতে বিস্কুটের টিন আর খবরের কাগজটা নিয়ে আফিসে ঢুকলুম।

সামনেই এক ভদ্রলোককে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে কায়দা দোরস্ত ভাবে একটা নমস্কার করে বল্লুম—"হরিপদ বাবু আছেন?"

ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"কেন ? বাক্স এনেছেন নাকি ?"

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ। টাকাটা কখন পাবো বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোকটি বল্লেন—"আপনি খানিক বসে থাকুন, আমি হরিপদ বাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

আমি একটা চেয়ারে বসে একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে লাগলুম। ভদ্রলোকটি একজন লোককে হরিপদ বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বেজে গেল। রাস্তার দিকের দরজাটাও সেই সঙ্গে সরে গেল। সে দিকে চোখ ফিরিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। চোখটা একবার ভাল করে মুছে দেখলুম—নাঃ, এ ভুল হতেই পারে না – আমার বাবাই সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রথমটা বাবাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তখনই আবার সামলে নিয়ে ভাবলুম – এদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা আদায় করে বাবাকে একটু তাক লাগিয়ে দি। আমি ভদ্রলোকটিকে আবার বল্লুম—"কৈ মশায় আমার টাকা ?"

ভদ্রলোকটি বল্লেন—"আমরা তো জানি না, ঐ ভদ্রলোক এখানে এসে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন—উনিই জানেন।"

আমি বল্লুম—"মিথ্যে কথা বলছেন কেন ? আমার বাবার নাম কোন কালে হরিপদ ঘোষাল নয়। এখ্‌খুনি আপনারা সত্যিকারের হরিপদ ঘোষালকে বার করুন বলছি।"

বাবা হঠাৎ এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—"থাম্‌।"

এবারে বাবার চালাকিটা সব বুঝতে পারলুম। হরি-পদ ঘোষালের নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাবা আমার অ্যাড্‌-ভেঞ্চারটিকে মাটি করে দিয়েছেন। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাবার সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসতে হল।

দ্বিতীয় অ্যাড্‌ভেঞ্চার

সবে গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে নতুন আষাঢ়ের মেঘ দেখা দিয়েছে। এই লম্বা ছুটির পর স্কুলটা আমার কাছে যেন কয়েদখানার মতো একঘেঁয়ে হয়ে উঠল। আজ স্কুল থেকে ফিরে আসবার একটু আগে ছোট এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছাদের এক কোণে পা ছড়িয়ে বসে আকাশ-ঘেরা আষাঢ়ের নতুন মেঘের সাজসজ্জার দিকে চোখ দুটো খুলে দিয়েছি। মাঝে মাঝে ভিজে হাওয়া এসে আমার মুখে চোখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে বৃষ্টির জলে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে লেগে আমার মনটাকেও অস্থির করে তুলছে। এক জোড়া ডানা পেলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঐ মেঘগুলোর সঙ্গে গা ভাসিয়ে কোথায় চলে যেতুম তার ঠিক থাকত না।

আর থাকতে না পেরে বলে উঠলুম—"উঃ, আর তো এখানে টেঁকা যায় না।" গেলবারকার অ্যাড্‌ভেঞ্চারটার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। এমন ভাবে আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারটিকে মাটি করে দেওয়ার জন্যে বাবার উপর রাগ ধরতে লাগল। বাবা বাধা না দিলে এতদিনে হয়ত

আমার কত খ্যাতিই দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত। কত লোকে আমার ভ্রমণবৃত্তান্তের রোমাঞ্চকর কাহিনী খবরের কাগজে ছাপাবার জন্যে আমাকে এসে পেড়াপিড়ি করত, কত লোক হয়ত সেই বৃত্তান্ত দফায় দফায় পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে দিন গুণতে থাকত। ছি ছি, বাবার জন্যে সমস্ত মাটি হল। এই তো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বয়েস। এত উৎসাহ, এত ক্ষমতা, এত তৎপরতা, এসব কি আর বয়েস হলে খুঁজে পাওয়া যায়? অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যেতে হয় তো এই বয়সেই যাওয়া উচিত। ভাবতে ভাবতে সমস্ত শরীরের সমস্ত রক্ত ঝাঁকিয়ে উঠল। বসে থাকতে পারলুম না। উঠে পড়ে জোরে জোরে পা ঠুকে ঠুকে ছাদের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল অবধি পায়চারি করতে লাগলুম। মনে হতে লাগল বোধ হয় এখনি একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ব।

আজবতত্ত্বটা তখনও পড়া হয়নি। মনটা একটু স্থির করবার জন্যে আজবতত্ত্বের পাতার উপর চোখ বোলাতে লাগলুম। একটা খবর দেখলুম—এক সাহেব, মেম ও তাঁদের ছোট ছেলে নাকি শ্লেজ্‌ গাড়িতে সাইবিরিয়ার মরুভূমি পার হবার জন্যে বেরিয়েছিলেন। অর্দ্ধেক পথ যাবার পর সাহেব মেম দুজনেই ঠাণ্ডায় মারা পড়েন। কিন্তু ছোট ছেলেটি অদ্ভুত সাহস এবং কৌশলে বরফের মরুভূমি পার হয়ে গন্তব্য স্থানে গাড়ী নিয়ে পৌঁছে গেছে।

এই নিয়ে কাগজে কাগজে হৈ হৈ ব্যাপার! আর সহ্য হল না। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলুম। একটা সামান্য সাহেবের ছেলে সাইবিরিয়া পার হয়ে যেতে পারে আর আমার দ্বারা কি কিছুই সম্ভব হবে না? দেখুক তবে একবার পৃথিবীর লোক এই বাবুই এর অ্যাড্‌ভেঞ্চার করবার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তার কাছে সাইবিরিয়া পার হওয়া তো তুচ্ছ কথা!

ভাবতে ভাবতে কোন রাস্তা দিয়ে কতটা এসে পড়েছি কিচ্ছু হুঁস ছিল না। যখন হুঁস হল তখন রাস্তাটাকে ঠিক চিনতে পারলুম না, কিন্তু রাস্তাটার কেমন একটা অদ্ভুত রকমের ভাব দেখে চমকে দাঁড়ালুম। সামনে দিয়ে দেখি কয়েকটা পুলিস হন্ হন্ করে একদিকে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন লোক ছুটে গলির ভিতর ঢুকে পড়ল; কতকগুলো দোকানের দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দোকান্দারেরা কোথায় সরে পড়ল। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে একটা বাঁদর-নাচ-ওয়ালা কয়েকটা বাঁদর নিয়ে চলেছে। বাঁদরগুলোর মধ্যে একটা ছোট্ট বাঁদরের বাচ্ছা—ঠিক সেবারকার সেই বাঁদর-বাচ্ছাটার মত—যেটা বিস্কুটের টিন চুরি করে এনে আমায় দিয়েছিল। ভাবলুম—ঐ বাচ্ছাটাকে কোন রকমে আদায় করতে হবে। ওরকম একটা বুদ্ধিমান

জন্তুকে যদি অ্যাড্ভেঞ্চারের সঙ্গী করে নিতে পারি তাহলে তো কেল্লা ফতে। ভাবতে ভাবতে বাঁদরওয়ালাকে ধরবার জন্যে তার পিছনে চলতে লাগলুম।

যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে আমার হাত চেপে ধরলে। পিছন ফিরে দেখি বিলিতি পোষাক পরা, দাড়ি গোঁফ কামানো এক অচেনা ভদ্রলোক! ভারি রাগ ধরল। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্লুম—"কে আপনি মশায়? খামকা হাত ধরেন কেন?"

বাবুটি আবার খপ্ করে আমার হাত ধরে বল্লেন—"ওদিকে যাচ্ছ কোথা?"

আমি রেগে বল্লুম—"ছাড়ুননা মশাই, বাঁদরওয়ালা চলে গেল যে।"

বাবুটি ভাবলেন, আমি বুঝি বাঁদর-নাচ দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। তিনি বল্লেন—"থাক্ থাক্, এই দাঙ্গা মারামারির বাজারে আর বাঁদর-নাচ দেখেনা। খুব হয়েছে।"

আমি বল্লুম—"আমি তো কচি খোকা নই যে বাঁদর নাচ দেখবার জন্যে ঘুম ধরছেনা। ছাড়ুন আমার অন্য কায আছে।"

বাবুটি বল্লেন—"কি কায শুনি?"

দেখলুম-এ তো আচ্ছা বেয়াদব। না শুনে কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি। বল্লুম—"আমি



অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছি, তাই আমার একটা বুদ্ধিমান বাঁদর চাই।"

বাবুটি বল্লেন—"আর একটু এগিয়ে যাও না হে বুদ্ধিমান বাঁদর, খুব অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে।"

চটে উঠে বল্লুম—"ও কি মশায়, খামকা গালাগাল দেন কেন ?"

বাবুটি তখন এক হাঁক দিলেন "পাহারাওয়ালা !" ঝড়ের মতো একটা পাহারাওয়ালা ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

বাবুটি পাহারাওয়ালাকে বল্‌লেন—"আমার থানায় নিয়ে গিয়ে একে রাখো। কোথাও যেতে দিও না।" পাহারাওয়ালা আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলে। পুলিশের বাবুটি হন্ হন্ করে একদিকে চলে গেলেন।

আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাই দেখতে পুলিশের সঙ্গে পুলিশবাবুর থানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম।

প্রায় সন্ধ্যা যখন হয়ে এসেছে, পুলিশের বাবুটি থানায় ঢুকলেন। একটা ঘরের মধ্যে আমি আটক ছিলুম। পুলিশের বাবুকে আসতে দেখে বল্লুম—"আর কেন ভদ্রলোকের ছেলেকে কষ্ট দেন মশায় ? ঢের হয়েছে। এইবার বিদায় দিন না।"

পুলিশের বাবু কোন কথা না বলে আমার আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর পিছন ফিরে একটা পাহারাওয়ালাকে কি যেন ইসারা করলেন। পাহারাওয়ালা এগিয়ে এসে ফস্ করে আমার দুহাতে

হাত-কড়ি লাগিয়ে দিলে। এবং পুলিশের বাবুর পিছনে পিছনে আমাকে টানতে টানতে একটা ছোট ঘরে এনে উপস্থিত করলে। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা কাগজে ভরা টেবিল আর তার পিছনে একটা উঁচু চেয়ার। আমাকে টেবিলের সামনে দাঁড় করানো হল ; পুলিশের বাবু চেয়ারে বসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"এখন সত্যি করে বল তোমার নাম কি ?"

আমার কথা কইতেও ঘৃণা হতে লাগল। আমি কোন উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইলুম।

পুলিশের বাবুটি বল্লেন—"এই শেষবার তোমায় আমি নাম বলতে হুকুম করছি। না বল্লে—"

আমি ভীষণ চটে বলে উঠলুম—"কেন মশাই, আমাকে কি আসামী পেয়েছেন নাকি ?"

পুলিশের বাবু বেশ সহজ স্বরে বল্‌লেন—"তুমি আসামী না তো আসামী কে ?"

অমি বল্লুম—"তার মানে ?"

পুলিশের বাবু বল্লেন—"সে কথা পরে হবে, এখন বল তোমার নাম কি ?"

আমি বল্লুম—"আমি বলব না।"

পুলিশের বাবু বল্লেন—"বেশ আমি বলছি—তোমার নাম 'ফক্‌রে গুণ্ডা'। গুণ্ডার সর্দ্দার! আজকে কলকাতা সহরে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়েছিল কে ? তুমিই তো!"

আমি বল্লুম—"কখনো নয়।"

পুলিশের বাবু বল্লেন—"নিশ্চয় তুমি। তার প্রমাণ পর্য্যন্ত আছে আমাদের কাছে। হ্যারিসন্ রোডে যেখানে তুমি দাঙ্গা সুরু কর, সেখানে তোমার ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত উঠে গেছে—এই দেখ।" বলে তিনি পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বার করলেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম—সত্যিই আমার চেহারা! কিন্তু কি করে হ্যারিসন রোডে আমার ছবি উঠল ভেবে পেলুম না; বরং আমার বাড়িতে দাদার তোলা যে ফটোগ্রাফটা ছিল এটা অনেকটা সেই রকমই বোধ হল।

পুলিশের বাবু বল্লেন—"তোমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে তুমিই আজকের দাঙ্গার জন্যে দায়ী।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"আপনার মত বোকা তো দেখিনি! এতটুকু ছেলে কখনো গুণ্ডার সর্দ্দার হতে পারে?"

পুলিসের বাবু হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে বল্লেন—"এতটুকু ছেলে! ফক্‌রে গুণ্ডাকে কে না জানে? সে চিরকালই ছোট্ট বেঁটে। ছেলেমানুষের মতো চেহারা—গোঁফ দাড়ি পর্য্যন্ত ওঠেনি। যাই হোক এখন তোমাদের আড্ডা কোথায় সেইটে বল।"

আমি রেগে বল্লুম—"আমি কি জানি গুণ্ডার আড্ডা কোথায় ?"

পুলিসের বাবু বল্‌লেন—"আমি তোমার বিচারক। তোমায় জিজ্ঞাসা করছি তোমাদের আড্ডা কোথায়—তার উত্তর দাও।"

আমি বল্লুম—"বিচার ঘর কখনো এরকম হয় না। সেখানে ঘর ভরা লোক গিস্ গিস্ করে। সাক্ষী সাবুদ থাকে, উকিল মক্কেল থাকে।"

পুলিসের বাবু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"গুণ্ডার বিচার এই ঘরেই হয়ে থাকে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম—"কেন মশাই, ভদ্রলোকের ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছেন। আপনার চালাকি সব বুঝতে পেরেছি।"

পুলিসের বাবু বল্‌লেন—"হুকুম হয়ে গেছে—কাল সকাল ছ'টার মধ্যে তুমি তোমার গুণ্ডার দলকে যদি ধরিয়ে না দাও তোমার ফাঁসী হয়ে যাবে—এই দেখ তার পরোয়ানা!"

সর্ব্বনাশ, একেবারে ফাঁসী! আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! আমি চীৎকার করে বল্লুম—"এ কি অন্যায় আপনার! গুণ্ডার খবর আমি কি জানি। আপনি আমার বাড়িতে লোক পাঠান। দেখুন না বাড়ির লোকে কি বলে।"

পুলিশের বাবু বল্লেন—"তোমার বাড়ি ? কোথায় তোমার বাড়ি ? সেই খোঁজই তো আমরা চাই।"

আমি বল্লুম—"৭নং শিবু সমাদ্দারের ষ্ট্রীট ! আপনি সেখানে লোক পাঠিয়ে বলুন আমার নাম বাবুই—আমি এখানে আটকা আছি।"

পুলিসের বাবু বল্লেন—"তোমার নাম বাবুই ! তা হতে পারে—গুণ্ডাদের অমন কত ছদ্ম নাম থাকে। তা যাই হোক্, আমি ৭নং শিবু সমাদ্দারের ষ্ট্রীটে খোঁজ নিচ্ছি।" এই বলে পুলিশের বাবু আমাকে একটা গরাদে দেওয়া ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে চলে গেলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখলুম পুলিসের বাবুটি আমার ঘরের দিকে আসছেন। আমি শুধোলুম—"আমার বাড়ীতে লোক পাঠিয়েছিলেন ?"

পুলিশের বাবু বেশ একটু চটা-মেজাজে বল্লেন—"তোমার জন্যে আমাদের আজ রীতিমত অপদস্থ হতে হয়েছে। ৭নং শিবু সমাদ্দারের ষ্ট্রীটে এক ভদ্রলোকের বাড়ি। সেখানে ফক্‌রে গুণ্ডার আড্ডা ব'লে খানাতল্লাস করতে গিয়ে আমাদেরই অপমান হয়েছে। কাল তোমার ফাঁসী মাপ হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—"ভদ্রলোকের বাড়িই তো ! আমার বাবা মা সবাই সেখানে—"

পুলিশের বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—"কোন কথা শুনতে

চাইনে। তোমার কোন কথায় বিশ্বাস নেই।" আমার মুখের সামনে একটা দরজা ঝম্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলুম সত্যিই আমি বন্দী!

এতবড় ভুল যে কলকাতার পুলিশের কাযকর্ম্মে ঘটতে পারে তা আমার এর আগে কোন কালেও জানা ছিল না! আর যে-সে ভুল নয়—একেবারে ফাঁসীর আসামীতে ভুল! আমি ভাবলুম—কালকে তো আমার ফাঁসী হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর যখন প্রকাশ পাবে আমি ফক্‌রে গুণ্ডা নই, আমি শ্রীবংশলোচন সরকারের ছেলে বাবুই, তখন? তখন আর কি? আমি তো ততক্ষণে মরেই গেছি! সেই গরমের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকার কল্পনা করে আমি হি হি করে কেঁপে উঠলুম!

মাথার মধ্যে নানা রকমের দুশ্চিন্তা মৌমাছির ঝাঁকের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম যেন সেই বাঁদরের বাচ্ছাটা এক মায়াবলে জেলখানার মধ্যে ঢুকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ খানাতল্লাসী! আমি ততক্ষণে আশ্চর্য্য এক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের দেশে পোঁছে অ্যাডভেঞ্চার সুরু করে দিয়েছি! কিন্তু পুলিশের বাবু তখনও আমায় ছাড়েন নি। ডিটেকটিভ সেজে আমায় গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছেন। আমি

প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন মতেই আমার পা চলছে না। পুলিশের বাবু হু হু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—আমায় ধরে ফেল্লেন বলে, আর দেরী নেই। আমি চীৎকার করে উঠলুম—"বাঁদর ভাই, বাঁদর ভাই, রক্ষা কর!"

এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ক্যাঁচ্ করে দরজা খুলে গেল। আমি দেখলুম পুলিশের বাবু! তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর! তিনি আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—"দেখ ফক্রে। কাল এই জেল-খানায় আমার কাছে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি একজন ফাঁসীর আসামী নিয়ে একটা ভয়ানক পরীক্ষা করতে চান। তোমাকেই সেই পরীক্ষা দিতে হবে।"

আমি শিউরে উঠে বল্লুম—"কি পরীক্ষা?"

পুলিশের বাবুটি বল্লেন—"তোমার তো ফাঁসী হবেই, কিন্তু সন্ন্যাসীর এই পরীক্ষা যদি সফল হয় তোমার প্রাণ বাঁচতেও পারে।"

আমি অস্থির হয়ে বল্লুম—"বলুনই না কি পরীক্ষা।"

পুলিশের বাবু বল্লেন—"তোমার গলাটা আমাদের জল্লাদ খড়গ দিয়ে এক কোপে কেটে ফেলবে আর সন্ন্যাসী মন্ত্র-পড়া জল সেই মাথার উপর ছিটিয়ে দেবেন। সন্ন্যাসী বলেছেন এই করলেই নাকি কাটামুণ্ডু আবার যোড়া লেগে যাবে, মরা মানুষ বেঁচে উঠবে! দেখা

যাক—যদি বেঁচে উঠতে পারো তুমি মুক্তি পাবে। কারণ একজন মানুষকে দুবার ফাঁসী দেবার আমাদের কোন আইন নেই। এখন এসো আমার সঙ্গে।"

কথাটা শুনে আমার মোটেই ভরসা হল না। আমি ভয়ে ভয়ে পুলিশের বাবুর সঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হলুম। পুলিশের বাবু বল্লেন—"চোখ দুটো জোর করে বুজে এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো। যতক্ষণ না কাটা-মুণ্ডু জোড়া লাগে একটুও নোড়ো না, বা একবারও চোখ খুলোনা। একটু নড়েছ কিংবা চোখ খুলেছ কি চিরকালের মত মরণ—আর প্রাণ ফিরে পাবে না!"

হাত পা সোজা করে চোখ বুজে আমি কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। পুলিশের বাবু বল্লেন—"আমি জল্লাদ আর সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসছি, সাবধান!" বলে তিনি চলে গেলেন।

একটু পরেই শুনলুম ঘরের মধ্যে কারা যেন ঢুকলো। তারপরই ঝন্‌ ঝন্‌ করে একটা শব্দ শুনতে পেলুম।..ঐ বোধহয় খড়গ বার করছে। হঠাৎ কে আমার মাথায় একটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে দিলে। ঐ রে বোধহয় খাঁড়ার কোপে আমার মাথাটা কেটে পড়ল। প্রাণপণে চোখ বুজে রইলুম। আমার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল হাত দুটো একবার তুলে দেখে নি মাথাটা সত্যিই ধড়ের উপরে নেই কি না। কিন্তু হাত নাড়বার তো যো নেই।

নড়লেই সর্ব্বনাশ! আমি আরো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। চোখ দুটো চাইতে লাগল একবার চট্‌ করে দেখে নেয় আমার গর্দ্দান নেওয়া হয়ে গেছে কি হয়নি, মুণ্ডুটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে না কাঁধের উপর লেগে আছে! কিন্তু উপায় নেই। চোখের পাতা খুললেই হয়ত সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!

খানিক বাদে মনে হল কে আমার মাথায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। ঐ বোধ হয় সন্ন্যাসীর মন্ত্রপড়া জল আমার মাথায় পড়ছে। কি হয় এখন, কি হয় এখন! আমি হাত দুটোকে প্রাণপণে আরো কাঠ করে রাখলুম। চোখ দুটোকে জোর করে বন্ধ করে রাখলুম।

এমন সময় শুনলুম কে যেন মোটাগলায় বলে উঠল —"সব ঠিক হো গয়া।"

আমি শুনলুম পুলিশের বাবু বলছেন—"ওহে এবার চোখ খোলো।"

ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে চোখ খুললুম। কি আশ্চর্য্য, আমার মুণ্ডু তো মাটির উপর গড়াগড়ি যাচ্ছেনা। কাঁধের উপর বেশ বসে গেছে। হাত দিয়ে একবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেখলুম—একটুও আলগা নেই—শক্ত ইঁট হয়ে জুড়ে গেছে। উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল! শুধোলুম—"সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা? একবার পায়ের ধূলো নেবো যে।"

পুলিশের. বাবু বল্লেন--"তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন।" আমি দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম বাবা সেখানে ঢুকছেন। আমি 'বলে উঠলুম—"একি, বাবা এখানে ?"

পুলিশেব বাবু ফিক্‌ কবে একটু হেসে বল্‌লেন— "ওকি ফক্‌রে তোমার বাবাও এসে পড়েছেন নাকি ? যাও যাও এইবেলা সরে পড়।"

আমার বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। আমি মাথা চুলকে ভাবতে ভাবতে চল্লুম—তাইত এ কি বকম হল ? এ কি রকম হল ?

বাড়ি এসে মা'র কাছে খাবার চাইতে গিয়ে শুনতে পেলুম মা তাঁর সইয়ের সঙ্গে বলাবলি করছেন—"আচ্ছা, কর্ত্তাব কি কাণ্ডটা দেখ দেখি। আমরা এদিকে ছেলে কোথা গেল ছেলে কোথা গেল বলে ভাবনায় মরে যাই, আর ও'দকে দুই বন্ধুতে মিলে এটুকু ছেলেকে সাবাটা বাত কি নাকালটাই করেছেন !

তৃতীয় অ্যাড্‌ভেঞ্চার

বারবার আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারগুলো এমনি ভাবে মাটি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমার ভারি রাগ হচ্ছিল। আমি মনে মনে ঠিক করলুম এখন দিন কতক চুপচাপ থাকা যাক; তারপর ভালো একটা সুযোগ পেলে এমন পালানো পালাবো যে আর আমায় খুঁজে বার করতে হবেনা। এই ভেবে আমি শান্ত শিষ্ট ছেলের মত দিন কাটাতে লাগলুম।

বাড়িতে দুষ্টু ছেলে বলে আমার খুব খ্যাতি ছিল, সেই আমি অমনি ধারা চুপচাপ হয়ে যেতে সকলে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলেন; মাসীমা তো খুসী হয়ে আমাকে একটা ম্যাজিক লণ্ঠনই কিনে দিলেন। কিন্তু বাবা আমাকে হঠাৎ ঐ রকম হয়ে যেতে দেখে আমার মনের ভাব ঠিক টের পেয়েছিলেন, তার প্রমাণ একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি পেয়ে গেলুম।

পড়বার ঘরের আলোটি জ্বেলে সবেমাত্র বই খুলে বসেছি, এমন সময় বাবা ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই বাবা পকেট থেকে চামড়ার নোট-কেস্‌টা বার

করে তার থেকে গুণে গুণে কয়েকটা নোট বার করতে লাগলেন। তারপর সেগুলোকে টেবিলের উপর রেখে বল্লেন—"এই নাও, আর তোমার কি কি জিনিস পত্র দরকার বল আনিয়ে দিচ্ছি।"

আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলুম, ভাবলুম, বাবা কি আমায় ত্যজ্যপুত্র করবার বন্দোবস্ত করছেন নাকি? কিছুই বুঝতে না পেরে বল্লুম—"কিসের দরকার? কি হয়েছে?"

বাবা গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"তুমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যাচ্ছ। তোমার কি দরকার তুমিই ভালো জানো, সে আমরা কি করে জানবো?"

আমি বল্লুম—"কে বল্‌লে তোমায় যে আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যাচ্ছি?"

বাবা বল্‌লেন—"সে কথা যাক্। তুমি যেতে চাও কি না?"

আমি বল্লুম—হ্যাঁ চাই।"

বাবা বল্লেন—"বেশ, বাড়িতে না বলে পালিয়ে যাবার আর দরকার নেই, আমরাই তোমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

—"বেশ।" বলে আমি আমার পড়বার ঘরে চলে গেলুম।

জলে স্থলে নানা রকম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প আমি

পড়েছিলুম। কিন্তু আমার সকলের চেয়ে ভাল লেগেছিল, আফ্রিকার জঙ্গলে এক বেলজিয়ান্ শীকারীর অ্যাড্‌ভেঞ্চার! আমাদের দেশেও সুন্দর বনের জঙ্গল আছে—সেইখানে যাবার জন্যে আমার মন লাফিয়ে উঠল। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাতে দেখলুম কালই সুন্দরবনে যাবার একটা ষ্টীমার পাওয়া যাবে। উৎসাহের চোটে সেদিন রাত্রে আর আমার ঘুম হল না।

সকাল বেলা একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লুম অ্যাড্‌ভেঞ্চারে। সুন্দরবনের শেষ সীমানার টিকিট কিনে জাহাজে চড়ে বসলুম। অনেক দিন আগে ষ্টীমারে করে একবার বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিলুম। সেবার মনে হয়েছিল, না জানি কতবড় একটা জলযাত্রাই করলুম। কিন্তু এবারে সেবারকার জলযাত্রাটাকে ছেলে-খেলার মতো লাগতে লাগল। যত দক্ষিণে চল্লুম—গঙ্গা ততই চওড়া হয়ে আসতে লাগল।

বিকেল বেলা আমাদের ষ্টীমার ডায়মণ্ডহারবারের ঘাটে এসে থামল। খালাসীরা এসে বলে গেল, আজকের মত ষ্টীমার এই খানেই থাকবে। কয়েকজন ভদ্রলোক এই শুনে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তাঁরা বল্লেন—কেন ষ্টীমার বাঁধা হবে? আমরা কি পয়সা দিইনি? মাল্লারা চুপি চুপি বল্লে—-এই ডায়মণ্ডহারবারে কাপ্তেন সাহেবের শ্বশুর বাড়ি। সেইখানে আজকের রাত্রিটা তিনি

কাটাবেন। সুতরাং হাজার চেঁচামেচি করলেও জাহাজ নড়চেনা। ভদ্রলোকেরা অত্যন্ত রাগত ভাব দেখিয়ে চুপ করে গেলেন। আমি আস্তে আস্তে স্টীমার থেকে নেমে তীরে গিয়ে উঠলুম।

গঙ্গার গা দিয়ে একটি লাল রংএর সরু রাস্তা। জল থেকে মাটিতে নেমে এই প্রথম বুঝলুম গঙ্গাটা এ জায়গায় কি প্রকাণ্ড চওড়া! আসল সমুদ্র যদিও এখান থেকে আরও ত্রিশ মাইল দূরে কিন্তু যেদিকটায় গঙ্গা গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে সেদিকে আকাশ আর জল একেবারে এক হয়ে গেছে।

সরকারি কাছারি থেকে একজন চাপরাশি আসছিল, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই লাল রাস্তাটা কতদূর গেছে। সে বল্লে, নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে বরাবর চলে গেছে। আমি বল্লুম, আচ্ছা, এখানকার যে কেল্লা, সেদিকে যাবার কোন পথ?

চাপরাশি বল্লে—এই রাস্তা ধরে সিধে গিয়ে বাঁ দিকে মাঠের পথে কেল্লা। বলে সে চলে গেল।

আমি লাল মাটির রাস্তা দিয়ে এগতে লাগলুম। ডায়মণ্ডহারবারের এই কেল্লার কথা আমি যুদ্ধের সময় শুনেছিলুম। যাতে ফস্‌ করে বাইরের কোন জাহাজ বাংলা দেশের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে তাই সমুদ্রের মুখে এই কেল্লা গড়া হয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধের সময় 'এমডেন' নামে জার্ম্মানদের একটা জাহাজের কাপ্তেন সাগর দ্বীপে নেমে লুটপাট করে চলে যায়। ডায়মণ্ডহারবারের কেল্লা থেকে দূরবীনে করে দেখা গেল 'এমডেন'-জাহাজ লুট করছে; কিন্তু দেখাই সার হল, কেল্লার কামানের গোলা অতদূর অবধি পৌঁছল না। তখন বোঝা গেল যে এখানে কেল্লা রেখে কোন ফল নেই। সেই থেকে এখানকার কেল্লা উঠিয়ে সাগর দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এই পরিত্যক্ত কেল্লাটা কেমন তাই দেখবার জন্যে আমার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল। রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে বাঁদিকের মাঠে নেমে পড়লুম। কোথাও একজন লোক দেখতে পেলুম না, যাকে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি। যাই হোক, কিছুদূর এগিয়েই একটা খালের মত পেলুম। কেল্লার চারিদিকে খাল কাটা থাকে জানি, মনে হল যেন কেল্লার কাছেই এসে পড়েছি। কিন্তু চারিধার ঝোপে ঝাপে গাছপালায় এমন ঢাকা যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার যো নেই যে কোনখানে অত বড় দুর্গটা লুকিয়ে আছে। খাল এখন শুকিয়ে গেছে—কালো রংএর একটি কি দুটি ক্ষীণ জলধারা ধীরে ধীরে বইছে। একটা পুরোনো রেলিং-ভাঙা কাঠের ব্রীজ আছে, তারই উপর দিয়ে খাল পার হলুম। এবং খানিকটা এগিয়েই বড় বড় খাগড়া-

বনের মধ্যে একটা মরচে-ধরা লোহার ফটক চোখে পড়ল।

ফটকটা অল্প একটু ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়লুম। বহুদিন আগে এখানে যে একটা ইটের রাস্তা ছিল একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এখন খোঁচা খোঁচা পাকা ঘাসে সমস্ত রাস্তা ঢেকে গেছে, কেবল তার মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা সুঁড়ি পথ—বোঝা যায় যে এখনও এখান দিয়ে মানুষের আনাগোনা আছে। এই রাস্তা ধরে আমি চলতে লাগলুম। ঘাস বনের মধ্যে প্রায়ই বড় বড় লোহার গোলা চোখে পড়ছিল। একটাকে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু এত ভারি যে নড়াতেই পারলুম না। কামানের গোলা দেখে মনে হল এতক্ষণে সত্যিকারের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

খানিকটা গিয়ে কতকগুলো নীচু নীচু স্যাঁৎসেতে মাটির ঘর চোখে পড়ল, বোধ হল বারুদের ঘর। এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো কবর দেখতে পেলুম—দুজন সৈন্যের কবর—পাথরের ফলকে তাদের মৃত্যুর ইতিহাস লেখা আছে। পড়ে দেখলুম তারা দুই ভাই, রাত্রের অন্ধকারে তাদের চিনতে না পেরে নিজেদের লোকই গুলি করে ফেলেছিল।

লেখাটা পড়ছি, এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পাথরের উপর ঠিকরে পড়েই মিলিয়ে

গেল। চারিদিকে চেয়ে কিছুই দেখতে পেলুম না; একটা খুব উচু বুরুজ দেখতে পাচ্ছিলুম, তার মাথায়



কাঁচের সার্সি দেওয়া একটা ঘর; মনে হল হয়ত সেই সার্সির গায়ে সূর্য্যের আলো লেগে অমন হতে পারে। বুরুজটা দেখে আমার একটু কৌতুহল হল, ভাবলুম

ওটার উপর চড়ে একবার দেখতে পারলে মন্দ হয়না। কিন্তু বুরুজের কাছে যাবার কোন রাস্তা খুঁজে পেলুম না। চারিদিকই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা। তা হোক, অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে গেলে অমন ঝোপ জঙ্গল দেখে পিছলে চলবেনা, আমি ঠিক করলুম, ঝোপ ডিঙিয়ে, কাঁটা মাড়িয়ে যেমন করে পারি যাবই। এমন সময় দেখি বুরুজের মথায় দপ্‌ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। কি আশ্চর্য্য, ওখানে কোন মানুষ আছে নাকি ?

দেখলুম আলোটা একবার জ্বলছে, একবার নিভছে —এরই আলো এসে কবরে পড়েছিল। বুরুজে চড়বার উৎসাহ আমার আরো বেড়ে উঠল। কিন্তু জঙ্গল ভেদ করে যাওয়া দেখলুম একেবারে অসম্ভব। একটা কাস্তে থাকলেও না হয় চেষ্টা করা যেতো, শুধু হাতে বৃথা চেষ্টা।

মনে পড়ল খানিকটা পিছনে বারুদের ঘরের পিছন দিয়ে বাঁ দিকে একটা সুঁড়ি রাস্তা গেছে, হয়ত সেটা দিয়ে গেলে বুরুজের কাছাকাছি যেতে পারি, এই মনে করে পিছন ফিরলুম।

সেই রাস্তা দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছি তো চলেইছি, রাস্তা আর ফুরোয় না। দুদিকে বড় বড় ঘাস, মধ্যিখানে রাস্তা, কোথায় যে চলেছি কিছুই ঠিক নেই।

কেল্লার মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেল্লুম নাকি ? নাঃ, এরকম করে আর কাঁহাতক চলা যায়। ভাবছি ফিরব, এমন সময় প্রকাণ্ড বুরুজটাকে দেখে চমকে উঠলুম। কিন্তু রাস্তা এবারে একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। পুটুস গাছের কাঁটাঝোপে পথ বন্ধ। রক্তপাতের মায়া করলে আর চলবেনা দেখছি। একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁটা সরাতে সরাতে চল্লুম। যত এগোই ঝোপ ততই ঘন হয়ে আসে। হাত, পা, কাপড়, জামা ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেল, ভয় হতে লাগল এইবার চোখ না যায়।

প্রায় পনের মিনিট হাঁচড়ে পিচড়ে কোন রকমে বুরুজের তলায় পৌছন গেল। তলাটায় প্রকাণ্ড চৌকো একটা গাঁথনি, গাছের শিকড়ে আগাগোড়া সমস্ত ফেটে চটা উঠে গেছে। কিন্তু বুরুজে ওঠবার সিঁড়ি ? গাছ পালা ডিঙিয়ে উল্টো পিঠে গিয়ে দেখি বেশ চমৎকার একটি লোহার গোল সিঁড়ি বুরুজের চুড়ো অবধি উঠে গেছে।

হু'হাতে সিঁড়ি ধরে আমি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলুম। সিঁড়ি বেয়ে চুড়োতে পৌঁছতে বেশী কষ্ট হল না। একটা রেলিং দেওয়া বারান্দা ছিল। চুপি চুপি গুঁড়ি মেরে সেই বারান্দায় উঠলুম। সামনেই একটা ঘর, দরজা বন্ধ। দরজার দুপাশে দুটো জানলার মত ছিল। আস্তে আস্তে তার ভিতর দিয়ে উঁকি মারলুম।

শূন্য ঘর—কোথাও কিছু নেই। আর একটা কাঠের দেয়াল দেখলুম। যদি রহস্যজনক কিছু থাকে তো সে ঐ ঘরেই। শূন্য ঘরের মধ্যে পা টিপে ঢুকলুম। তারপর কাঠের বেড়ায় কান রেখে ও-ঘরের শব্দ শোনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কোন শব্দই নেই। আমি তখন ধীরে ধীরে কাঠের দরজায় হাত দিলুম। একটু ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

একটা তীব্র গ্যাসের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আলোর কাছে বসে একজন লোক হুমড়ি খেয়ে কি যেন লিখছে বলে মনে হল। দরজা খোলার শব্দে লোকটা পিছন ফিরে তাকালে। তার চেহারা দেখে আমি ভয়ে চীৎকার করে পিছিয়ে গেলুম। লোকটার চোয়ালের উপর থেকে একটা চোখ পর্য্যন্ত মুখের আধখানা অংশই নেই। জায়গাটা যেন কিসের আঘাতে উড়ে গেছে। ঐ বীভৎস চেহারা দেখেই আমার আত্মারাম শুকিয়ে গেছে। এ কি ভূত না মানুষ ? হঠাৎ লোকটা বিকট শব্দে হো হো হো করে হেসে উঠল।

আমি মনে সাহস এনে একটা জলচৌকির উপর বসে পড়লুম। লোকটা একটু হেসে বল্লে—"কি, ভয় হচ্ছে নাকি ?" আমি কোন জবাব দিলুম না। লোকটা তেমনি হেসে আবার বল্লে—"এখানে কি মনে করে আসা হয়েছে ?"

কি বিশ্রী হাসি! আমি বল্লুম—"জায়গাটা দেখতে এসেছি। এটা কিসের ঘর?"

—"কিসের ঘর? হুঁ হুঁ অত সহজে জানা যাবে না। ঐ চৌকিতে বসা হোক্। আমি ততক্ষণে লিখে নি।" বলে আবার সেই বিশ্রী হেসে লোকটা পিছন ফিরে লিখতে লাগল। ওর ঐ হাসিটা আমার একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটার মৎলবখানা কি? বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এই অন্ধকারে পথ খুঁজে ষ্টিমারে ফিরে যেতে হবে তো? ভাবলুম চুপিসাড়ে সরে পড়ি। লোকটা পিছন ফিরে একমনে লিখে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কাঠের দরজাটা খুল্লুম। লোকটা কিছুই টের পেলেনা। পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকাশে দেখলুম চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছে। তবু ভাল, অন্ধকারে হাৎড়াতে হবে না। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! কত উচুতে আমি উঠেছি! যদি নামতে যাই, নির্ঘাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাবো।

কি ভাগ্যিস একটু পরে দৃষ্টিটা সয়ে এল। মনে হল কোনরকমে নামতে পারব। সিঁড়িতে পা বাড়াতে যাবো এমন সময় ঠং ঠং একটা শব্দে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন লোক খড়ম পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে—তার হাতে একটা খোলা ছোরা! কি সর্ব্বনাশ!

ছোরা ! আর নীচে নামা হল না। আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। এদের ব্যাপারখানা কি তা কিছুই আমার মাথায় ঢুকলনা। আমি আবার পা টিপে টিপে সেই ঘরে ফিরে গেলুম। এবার দরজা খুলতেই লোকটা দেখে ফেল্লে। বল্লে—"কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?" আমি জলচৌকিতে বসে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লুম—"এখানেই ছিলুম।" লোকটা আবার সেইরকম হেসে বল্লে—"পালানো না হয় যেন। একটু খেয়ে যেতে হবে।"

রহস্য আরো জটিল হয়ে এলো, কিছুই বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সেই ছোরা হাতে লোকটা ? সে তো এখনি ঘরে ঢুকবে ! বলতে বলতে সে দরজা ঠেলে ঘরে এসে উপস্থিত। তার হাতে তখনও সেই ছোরাটা !

চোয়াল-ওড়ানো লোকটা চোখটা একটু ঠেরে তাকে বল্লে—"এঁকে একটু মুরগীর যুস্‌ খাইয়ে দাও।"

কথাটা ঠাট্টা না আর কিছু তা বুঝতে পারলুম না। ছোরাওয়ালা লোকটা কিন্তু একটা দেয়াল-আলমারির মধ্যে ছোরাটাকে রেখে খড়ম খটাস্‌ খটাস্‌ করতে করতে নেমে গেল।

খানিক বাদে সে সত্যিই যখন দু টুকরো রুটি আর এক প্লেট মুরগীর ঝোল আমার সামনে নিয়ে এল, তখন গন্ধে আমার জিভ দিয়ে জল ঝরছে—কিন্তু ভীষণ সন্দেহ হল এই খাবারের মধ্যে নিশ্চয় কোন ওষুধ মেশানো

আছে। আমি ঘোর সন্দেহে তাঁদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম।

লিখিয়ে লোকটা বলে উঠল—"ভাবা হচ্ছে কি? হয়ে যাক।" আমি আর কথা এড়াতে না পেরে একনিঃশ্বাসে সেটা শেষ করে দিলুম। তা হলেও খেতে খুবই ভাল লাগল। একে খিদে পেয়েছিল, তার উপর গরম গরম মুরগীর ঝোল—যেন অমৃতের মত।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে আমি বল্লুম—"আজকের মতো আমি তাহলে উঠি।"

লিখিয়ে লোকটি খড়ম-ওয়ালাকে বল্লেন—"যাও, পথ দেখিয়ে দাও।"

মনে মনে ভাবলুম—এরা কোন মতেই ছাড়বেনা দেখছি, জ্বালালে। বল্লুম—"আমি পথ চিনে নিতে পারব।"

কিন্তু তিনি শুনলেন না। বল্লেন---"কিছুতেই পারবে না। এই অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ চেনা খুব শক্ত।"

লোহার মই বেয়ে নীচে নেমে এলুম। খড়ম-ওয়ালা একটা খুব সর্ট-কাটে আমাকে একেবারে গঙ্গার ধারের রাস্তায় এনে ফেল্লে। এ রাস্তাটা আমার মোটেই জানা ছিল না। থাকলে বনের মধ্যে কানামাছির মত এত ঘুরতে হত না। মুরগীর ঝোলের মধ্যে কোন ওষুধ

ছিল কিনা জানি না, আমার তো সেটা খেয়ে শরীর আগের চেয়ে সুস্থ বোধ হতে লাগল। খড়ম-ওয়ালা লোকটার মধ্যেও কোন কুমৎলব দেখতে পেলুম না। কারণ সে আমায় রাস্তায় পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। কিন্তু বুরুজের ঘরের ব্যাপারটা আমার কাছে আরো যেন রহস্যজনক বলে বোধ হতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে গঙ্গার ধার দিয়ে চলেছি। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। একটু ইতস্ততঃ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—"হ্যাঁ মশাই, ওটা কিসের বুরুজ বলতে পারেন ?"

তিনি বল্লেন—"আলোর ঘর।"

—"আলোর ঘর ? সে কি জিনিস ?"

—"ওখান থেকে আলো ফেলে জাহাজে সিগ্‌ন্যাল্‌ করে।"

—"তাই নাকি ? ওখানে যিনি থাকেন, তাঁর কাছ থেকে আমি আসছি।"

ভদ্রলোক খুব আগ্রহ দেখিয়ে বল্লেন—"আমিও তো সেইখানে যাচ্ছি। ভারি অমায়িক লোক, না ? আপনাকে খাইয়ে দেননি ? না খাইয়ে উনি কাউকে ছাড়েন না। চোয়ালের কথা বলছেন ? ভদ্রলোক যুদ্ধে গিয়েছিলেন। বোমা লেগে মুখের ঐ অংশটা

উড়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে একজন বাবুর্চি আছে দেখেন নি? সে-ই ওঁকে মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে আসে। সে না আনলে ওঁর বাঁচবার কোন আশা ছিল না। আনবার সময় বাবুর্চির পায়ে গোলার চোট লাগে, তাতে দুটো পা-ই ওর কেটে ফেলা হয়েছে। দেখলেন না, কাঠের পা? অথচ ঐ কাঠের পা নিয়ে কেমন সহজ মানুষের মত হেঁটে বেড়ায়?"

আমি অবাক হয়ে বল্লুম—"কাঠের পা? আমি যে ভাবছিলুম খড়ম? তা, ওর হাতে একটা ছোরা ছিল কেন?"

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে বল্লেন—"ছোরা? ও বুঝেছি। বুঝেছেন না? ইঁদুর ছেলে হলে হবে কি? যুদ্ধে গেছেন কি না—একটু মুর্গী টুর্গী না হলে চলে না। আপনার এ সম্বন্ধে কোন রকম সংস্কার আছে নাকি?"

আমি বল্লুম—"বিন্দুমাত্রও নয়। আমি তো ঐ খেয়েই আসছি।"

ভদ্রলোক চলে যেতে আমি ভাবলুম—আজকের অ্যাড্‌ভেঞ্চারটা হুবহু গল্পের মত। এটাকে না লিখলেই নয়। বাড়ি গিয়ে পড়বার টেবিলে বসে এটাকে লিখে ফেলি। তারপর আসল অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বন্দোবস্ত করব। এই ভেবে সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে ডায়মণ্ডহারবার থেকে বাড়ি ফিরে গেলুম।

চতুর্থ অ্যাড্‌ভেঞ্চার

কাল বিশ্বকর্ম্মা পূজোর ছুটি গেছে। দুপুর বাজতে না বাজতেই চন্‌চনে রোদ মাথায় করে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাদে উঠেছিলুম আর যতক্ষণ-না সন্ধ্যার ছায়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণ কোনমতেই নীচে নামিনি। আঃ—আকাশের শোভাটা কাল যা খুলেছিল—যেন একটা স্বপ্নের রাজ্য! কত রকমের কত রংএর ঘুড়ি! লালেতে নীলেতে সব্‌জেতে সাদাতে মিশে আকাশ ভরে যেন রংএর বান ডাকিয়ে দিয়েছিল। যেদিকে তাকাই —গাছের ডালে, ছাদের পাঁচিলে, টেলিগ্রাফের তারে, বাঁশের ডগায় সব জায়গাতেই ঘুড়ি! ঘুড়ির রঙে রঙে সমস্ত সহর যেন রঙিন্‌ হয়ে উঠেছিল। আমার হাত কাল আশ্চর্য্য রকম খুলে গিয়েছিল। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে যে কেউ আমার ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ লাগাতে আসছিল কেউ আমার কাছে পেরে উঠছিল না! ঘুড়ির পর ঘুড়ি কাটতে কাটতে আমার ময়ুর-পঙ্খী ঘুড়িটা দিগ্বিজয়ী বীরের মতো আকাশের এ কোন থেকে ও কোন পর্য্যন্ত যখন আনাগোনা করছিল, তখন বোধহয় ছাদে ছাদে

সাড়া পড়ে গিয়েছিল কেমন করে আমার ঐ ময়ূর-পঙ্খীকে হারিয়ে দেওয়া যায়! একসঙ্গে চার পাঁচটা ঘুড়ি আমার সুতোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করছিল, কিন্তু প্যাঁচ লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সুতো যেন কোন যাদুবলে কেটে যাচ্ছিল। আমি বিজয় গর্বে আত্মহারা হয়ে উঠছিলুম। এমনি করে ঘুড়ির রঙিন্ জগতে কালকের দিনটা কেটে গেছে।

আজ বেলা তিনটের সময় ছাদে উঠে আজবতত্ত্বটা খুলতেই চোখে পড়ল প্রথমেই একটা লেখা বেরিয়েছে—"হায়রে মোদের শিশুর দল!" পড়তে সুরু করে দিলুন। পড়তে পড়তে সমস্ত শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। লেখক জ্বালাময়ী ভাষায় লিখে যাচ্ছেন—এই দেশের ছেলেরা অন্য দেশের ছেলেদের তুলনায় কত ভীরু কত বোকা কত প্রাণহীন কত নিরুৎসাহ নিস্পন্দ! অন্য দেশের ছেলেরা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক কাঁধে করে শিকার করে বেড়ায়, সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ খেয়ে বেড়ায়, মরোমারি লাঠালাঠি করে বেড়ায়; কেউ চড়ে এরোপ্লেনে, কেউ করে সার্কাস, কেউ হয়ত বাড়ি ঘর ছেড়ে একলাই পালিয়ে যায় দেশ ঘুরতে। আর আমাদের ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই কেউ হয়ত আবার বই খুলে বসে, কেউ লাট্টু ঘুরিয়ে, কেউ বা ঘুড়ি উড়িয়েই সময় কাটিয়ে দেয়। পড়তে পড়তে আমার সমস্ত শরীর

আগুনের মতো গরম হয়ে উঠতে লাগল। নাঃ একটা কীর্ত্তি করে এদের না দেখালে আর চলেনা দেখছি। আমাকে বেরতেই হবে। অ্যাড্‌ভেঞ্চারে আমাকে আবার বেরতে হবে, সে যে যতই বাধা দিক্। আমি বেশ বুঝছি আমাদের ছেলেদের এই দুর্ণাম ঘোচাবার কর্ণধার যদি কেউ হয় তো সে আমি।

আজও আকাশ ঘুড়িতে ঘুড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। আজবতত্ত্বের রাজ্য থেকে আমার মনটা মধ্যে-মধ্যে আকাশ রাজ্যে ঘুড়ির সুতো বেয়ে বেয়ে প্যাঁচের রাজ্যে পোঁছে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলছিল। মাকড়ষার জালে যেমন মাছি আটকা পড়ে, ঐ আকাশ-বেড়া ঘুড়ির সুতোর জালের মধ্যে আমারও মনটা মাঝে মাঝে নিঃসহায় ভাবে আটকা পড়ে যাচ্ছিল। প্রাণপনে তাকে আবার টেনে বার করে আনছিলুম। মাথার উপর চতুর্দ্দিক থেকে ফর্‌র্ ফর্‌র্ শব্দে নানান্ ঘুড়ি ডেকে বেড়াচ্ছিল—যেন তারা সবাই আমাকে আজ প্যাঁচ খেলবার জন্যে ডাক দিতে এসেছে। থেকে-থেকে মনে হচ্ছিল—কালকের মতো আজও একবার আমার ক্ষমতাটা দেখিয়ে দি। কিন্তু আজবতত্ত্বের সেই লেখাটার উপর চোখ পড়তেই দৃঢ় স্বরে বলে উঠছিলুম—নাঃ আর নয়। ঘুড়ি উড়িয়ে আর নিজেকে খাটো করব না!

মাথার উপর ঘুড়ির ঝাঁক ক্রমেই বেড়েই চল্লো।

প্যাঁচের পর প্যাঁচ খেলা হতে লাগল। আমার পক্ষে বসে বসে তাই দেখা আর সহ্য হলনা। আজবতত্ত্বটি মুড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলুম।



আমার মাথার মধ্যে যে মৎলবটা এসেছিল তা শুনলে বাবা-মা নিশ্চয়ই আঁৎকে উঠবেন, তাই ভাবলুম, কাযটা

করবার আগে কাউকে জানাবো না। তা ছাড়া বাবা বাড়ি ছিলেন না, শুনলুম কলকাতার বাইরে কোথায় যেন নিমন্ত্রন খেতে গেছেন। আমি জুতোটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আজ সহর-শুদ্ধ লোককে আমার কীর্ত্তি দেখিয়ে অবাক করতে হবে!

খানিকটা শক্ত দেখে দড়ি কিনে নিয়ে দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের একটা বাসে গিয়ে উঠলুম। দমদমায় পেঁাছে আমি চল্লুম, যেখান থেকে উড়ো জাহাজ ওড়ে, সেই মাঠের দিকে! মাঠে পেঁাছে দেখি দুটো তিনটে উড়োজাহাজ মাঠের উপরেই ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর একটা মাটিতে দাঁড়িয়ে ওড়বার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আমি কোমরে দড়ি খানাকে পাক দিয়ে বেঁধে দড়ির অন্য মুখে একটা বড় গোছের ফাঁস তৈরী করতে করতে এগতে এগতে উড়োজাহাজের ঠিক ল্যাজটির কাছটিতে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মৎলবটা এই যে যেই জাহাজটা উড়তে যাবে, আমার ঘুড়ির লঙ্গর ছোঁড়া হাতের অব্যর্থ লক্ষ্যে উড়োজাহাজের লেজের মধ্যে দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে ফেলব! তারপর যে কি হবে, তা আমি জানিনা। এ জায়গায় এই আমি প্রথম এসেছি; উড়োজাহাজ কেমন করে আকাশে ওড়ে তা আমি জানিনা। হয়ত উড়োজাহাজ ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজে বাঁধা আমি শুদ্ধু শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে উড়ে চলব। ঐ রকম ভাবে ঝুলতে ঝুলতে

আকাশের মধ্যে দিয়ে দেড়শ' মাইল বেগে ছুটে চলতে কেমন লাগবে, তা আমি জানি না। কিন্তু হাজার হাজার লোক আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে যখন শিউরে উঠবে, উড়োজাহাজ আমায় নিয়ে সারা কলকাতা সহর ঘুরে আসবে, তারপর মাটিতে নামলে আমার চারিদিকে হাজার হাজার লোক ঘিরে আসবে—তারপর যখন সবাই জানবে আমি বাবুই ইচ্ছে করেই এই অ্যাড্‌ভেঞ্চার করেছি, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় আমার এই আশ্চর্য্য সাহসের কথা সগৌরবে ছাপা হবে—তখন আমার অবস্থাটা যে কি রকম হবে, এ যেন আমি চোখের সামনে বায়স্কোপের মত দেখতে পাচ্ছিলুম!

কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল, এই ফাঁকা মাঠের ভিতর এত লোকের চোখে ধূলো দিয়ে কেমন করে কাজটা হাসিল করি। এরা আমার মৎলব টের পেলে হয়ত উড়োজাহাজের কাছে দাঁড়িয়েই থাকতে দেবে না। কাযেই কোন মতেই মৎলব টের পেতে দেওয়া নয়—এই ভেবে ভালো মানুষের মত মুখ করে উড়ো-জাহাজের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগলুম। ঠিক করলুম, যেই সামনের পাখাটা গোঁ গোঁ করে ঘুরতে স্থুরু করবে অমনি ফাঁস ছুঁড়ে মারব! আমার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য লঙ্গর মারার সময় কোনদিন কোন ঘুড়ির সুতোর উপর ব্যর্থ হয়নি—আজও তা হবে না। দেখলুম, একজন লোক মাথায়

মুখোস পরে চোখে এক জোড়া প্রকাণ্ড চশমা এঁটে উড়োজাহাজের কাছে চলেছেন। বুঝলুম ইনিই জাহাজ চালাবেন। এইবার আমার প্রস্তুত হবার সময়!

ল্যাজের পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি; একদৃষ্টে চেয়ে আছি উড়োজাহাজের পাখা দুটোর উপর—একবার ঘুরলেই হয়। ফাঁসটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে বাগিয়ে ধরেছি—নিঃশ্বাস একদম বন্ধ! এমন সময় আমার পিছন থেকে—"এই যে রে, এই যে! পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!" বলে কারা চীৎকার করে উঠল। পিছন ফিরে তাকাতে না তাকাতে দু'তিন জন লোক হুড়মুড় করে এসে আমায় ধরে ফেল্লে! মনে মনে ভাবলুম সর্ব্বনাশ! তবে তো এরা আমার মৎলব টের পেয়েছে দেখছি! তাদের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। ভোঁ—ভোঁও করে উড়োজাহাজটা গর্জ্জন করে উঠল।

তাদের মধ্যে একজন লোক বলে উঠল—"ভাবছ ফাঁকি দিয়ে পালাবে? সেটি হচ্ছেনা।"

আমি আমতা আমতা করে বল্লুম—"আজ্ঞে না আমি তো পালাতে চেষ্টা করিনি।"

তিনি ধমকে উঠে বল্লেন—"পালাও নি তো কি? তবে কি এখানে হাওয়া খেতে এসেছ? ওসব হচ্ছে না, তোমাকে আমরা সহজে ছাড়চিনে।"

· আমি বল্লুম—“না মশায় আমি পালাতে আসিনি—আবার এইখানেই তো এসে পড়তে হ'ত আমাকে।”

লোকটা বলে উঠল—“তা তো হতই, পালিয়ে কি আর তুমি নিস্কৃতি পেতে? হেডমাষ্টারমশাই অত সোজা লোক নন—তোমার জন্যে হলদে কুঠিতে বসে আছেন—চলনা একবার!”

বুঝলুম—তাহলে হেডমাষ্টারমশাই শুদ্ধ আমার কীর্ত্তি শুনেছেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি করে খবরটা রটে গেল ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলুম। হেডমাষ্টার-মশাই যে সোজা লোক নন্ তা আমি বিলক্ষণই জানতুম—কিন্তু তাই বলে যে তাঁর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব, এ আমি কিছুতেই পারব না। বুক ফুলিয়ে বল্লুম—“চলুন না হেডমাষ্টারমশা'র কাছে, ভয়টা কিসের?”

খানিকটা হেঁটে আমরা একটা বাড়ির কাছে এসে পোঁছলুম। আমাদের দেখতে পেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে একজন বাবরী-চুল-ওয়ালা ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন। কিন্তু আমায় দেখেই—“আরে দূর, এ কাকে নিয়ে এলি, এ তো বোঁচকা নয়।” বলেই থপ্‌ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমি বাবরী-চুলো হেড-মাষ্টারের মুখের দিকে খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম, কিছুই বুঝতে পারলুম না। যে লোকটি আমায় ধরে এনেছিলেন তিনি

বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে বল্লেন—"বড় ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে ঠিক মত চিনতে পারিনি।"

তখন ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। দেখেছ! কার সঙ্গে ভুল করে কাকে ধরে আনলে ব্যাটারা! ভয়ঙ্কর রাগ হল। গর্দ্দভগুলোর গাধাবুদ্ধিতে আমার এমন অ্যাড্‌-ভেঞ্চার মাটি হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠলুম—"পাজি ব্যাটারা আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চার মাটি করে দিলে, আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসা হচ্ছে!"

বাবরী-চুলো হেড-মাষ্টার আমার মেজাজ দেখে কাঁচু-মাচু হয়ে বল্লেন—"মাপ করবেন, এরা আপনাকে চিন্‌তো না, আপনার হাতে দড়ি দেখে ভুল করে নিয়ে এসেছে।"

ওদিক থেকে আর একজন বলে উঠল—"আপনিই তো বলে দিলেন মশাই– সে দড়ি শুদ্ধ নিয়ে পালিয়েছে, তার হাতে দড়ি আছে – দড়ি দেখলেই নিয়ে আসবে।"

হেড-মাষ্টার বল্লেন,—"তাই বলে পৃথিবী শুদ্ধ দড়ি ওয়ালা ধরে আনতে বলেছিলুম নাকি?"

এদের কথাবার্ত্তাগুলো ভারি মজার লাগতে লাগল। তার উপর আমায় নিয়ে এরা এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে দেখে মনে-মনে একটু খুসী হয়ে নরম স্বরে বল্লুম—"কি হয়েছিল, বলুন তো ব্যাপারটা।"

হেডমাষ্টারমশাই বল্লেন—"ব্যাপারটা হচ্ছে আজ কদিন ধরে এখানকার নানা ইস্কুলে মিলে স্পোর্টস্‌

হচ্ছে। তার মধ্যে আছে দৌড়োনো, লাফানো, সাঁতার, তীর ছোঁড়া, ঘোড় দে.ড়, বন্দুক ছোঁড়া, আর লঙ্গর ছোঁড়া—"

আমি বল্লুম—"লঙ্গর ছোড়া ? সে আবার কি ?"

হেডমাষ্টারমশাই বল্লেন—"ওটা একটা নতুন খেলা—দড়ির মাথায় ফাঁস করে ফাঁস ছুঁড়ে মারতে হয়। তা ব্যাপার হয়েছে কি—আমাদের এই দড়ি-ছুঁড়িয়েকে আজ পাওয়া যাচ্ছেনা ! তাকে খুঁজে আনতে গিয়ে আপনার হাতে দড়ি দেখে এরা আপনাকে ভুল করে ধরে এনেছে—কিছু মনে করবেন না।"

আমি বল্লুম—"ঘটনাটা ভাল বুঝতে পারলুম না। একটু পরিষ্কার করে বলুন না।"

হেডমাষ্টারমশাই বল্লেন—"কম্পিটিশানটায় আমাদের ইস্কুল পয়েণ্টে ফার্স্ট যাচ্ছে ! আজকের বাকি আছে শুধু তীর ছোঁড়া আর লঙ্গর ছোঁড়া ! আজকে জিততে পারলেই আমরা চাম্পিয়ান হয়ে যাবো ! আমাদের তীর-ছুঁড়িয়ে কেউ ভাল নেই—ওটাতে আমরা হেরে যাবো জানি। কিন্তু আমাদের আজকের জিত নির্ভর করছে—কেবল ঐ বোঁচকা ছোঁড়াটার উপর। লঙ্গর ছোঁড়ায় ওর জোড়া এ তল্লাটে কেউ নেই। কিন্তু দেখুন দেখি বিপদ ; খেলা আরম্ভ হতে আর আধঘণ্টা মাত্র দেরী—এখনও সে এসে হাজির হয়নি। তার বাড়িতে লোক

পাঠিয়েছিলুম ; তাঁরা বলেন, আজ ভোরবেলা বাড়িতে ঝগড়া ঝাঁটি করে গলায় দড়ি দেবে বলে ভয় দেখিয়ে একটা দড়ি নিয়ে কোথায় সে পালিয়ে গেছে ! এই এত কাণ্ড, অথচ বাড়ি থেকে আমাদের কিছুই জানান হয়নি। গলায় তো আর সে সত্যিই দড়ি দিচ্ছেনা, নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে কিন্তু এত বেলায় এখন কোথায় তার খোঁজ করি বলুন তো ? চারিদিকেই লোক পাঠিয়েছি। সবাই তাকে চেনেনা—তাই আপনার হাতে দড়ি দেখে আপনার সঙ্গে ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না—"

আমি বল্লুম—"কিন্তু যদি সে সত্যিই গলায় দড়ি দিয়ে থাকে, কিংবা যদি সে আজ না-ই আসে তাহলে কি হবে ?"

হেডমাষ্টারমশাই বল্লেন—"তাহলে হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। নন্দীদের ইস্কুল এ-বছর চাম্পিয়ান হয়ে যাবে।"

আমি বল্লুম—"এক কায করুন। আমাকে আজই এখনই আপনাদের ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে নিন্। আমি এই লঙ্গর ছোঁড়ার কম্পিটিশানে নাম দেব, দয়া করে আমার নামটা পাঠিয়ে দিন।"

হেডমাষ্টারমশাই অবাক হয়ে বল্লেন—"কেন বলুন ত ? আপনার কি লঙ্গর ছোঁড়ার ভাল হাত আছে নাকি ?"

আমি প্রশ্নটাকে চাপা দিয়ে বল্লুম—"আর আমাকে 'আপনি' বলে ডাকবেন না।"

হেডমাষ্টারমশাই মাথা নেড়ে বল্লেন—"তা বেশ, কিন্তু ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে তোমার অভিভাবকের মত চাই যে।"

আমি বল্লুম—"অভিভাবকের মত আমি কাল সকালেই আপনাকে এনে দেব। আমায় ইস্কুলে নিয়ে নিন্।"

হেডমাষ্টারমশাই বল্লেন—"তা বেশ, তোমার যখন এত ইচ্ছে—"

আমি বল্লুম—"শুধু বেশ নয়, দড়ি ছোঁড়ার কম্পিটিশানে আমি যোগ দিচ্ছি বুঝলেন?"

হেডমাষ্টারমশাই বল্লেন—"তা দিতে পারো, অনেকেই তো দিচ্ছে। কিন্তু এদিকে যে সময় হয়ে এলো; বোঁচকাটা আচ্ছা মুস্কিলে ফেল্লে; যাই আমিই একবার খুঁজে আসি—" বলে সেখান থেকে উঠে গেলেন।

আমি ছেলেদের দলের মধ্যে মিশে পড়লুম। লঙ্গর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতাটা কি জিজ্ঞেস করতে ছেলেরা বল্লে—একটা পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা বড় বয়া ভাসানো থাকে। তার মাথায় একটা রূপোর নিশেন পোঁতা। বয়ার গায়ে বড় বড় লোহার কাঁটা; এই কাঁটার গায়ে দড়ি ছুঁড়ে ফাঁস লাগিয়ে টানতে হয়। যে আগে রূপোর নিশেনটা নিতে পারে তারই জিত।"

আমি বল্লুম—"যখন চার পাঁচ জনে একসঙ্গে কাঁটার গায়ে ফাঁস লাগিয়ে ফেলে তখন ?"

ছেলেরা বল্লে—"তখন তাদের মধ্যে টানাটানি পড়ে যায় ; যে আগে রূপোর নিশেন নিতে পারে তারই জিত।"

এই নতুন রকমের খেলাটার কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগল। আমি আমার ঘুড়ির লঙ্গর-ছোঁড়া হাত দুটোর কথা ভেবে বেশ একটা গর্ব্ব অনুভব করলুম, এবং সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র যে-অ্যাড্‌ভেঞ্চারটা ফস্কে এসেছি তার দুঃখ বেমালুম ভুলে গেলুম।

একটু পরেই মাঠে যাবার ডাক এলো। আমি ইস্কুলের ইউনিফর্‌ম্ পরে নিয়ে মাঠে ছুটলুম। টেণ্টে পোঁছে হেডমাষ্টারমশা'র ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, একজন হাত নেড়ে বারণ করলে। একটুখানি উঁকি মেরে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। দুইচক্ষু রক্তবর্ণ, সজোরে মুঠো পাকানো, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, হেডমাষ্টারমশাই ঘরের মধ্যে কেবল এদিক আর ওদিক পায়চারী করছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে শুনলুম নন্দীদের ইস্কুল নাকি ঘুস দিয়ে আমাদের দড়ির চাম্পিয়ান বোঁচকাকে নিজেদের ইস্কুলে নিয়ে গেছে। বাড়িতে ঝগড়া ঝাঁটি, গলায় দড়ি, এসব খবরই মিথ্যে ! এই শুনেই হেডমাষ্টারমশাই রাগে অগ্নিশর্ম্মা। এখন সকলে ভয় পাচ্ছে রা গর চোটে হেড-মাষ্টারমশাই একটা মাথা-ফাটাফাটি কাণ্ড না বাধিয়ে বসেন।

আমার আর বসে বসে হেডমাষ্টারমশাইকে দেখবার সময় ছিল না। খেলোয়াড়দের সকলের নাম ডাকা হল। সকলের হাতে দড়ি দিয়ে পুকুরের চারিদিকে দাঁড় করিয়ে রেলিংএর সঙ্গে পা বেঁধে দেওয়া হল, যাতে কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়তে না পারে। তারপর রেফারি গুড়ুম করে একটা পিস্তল ছুঁড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সাপের মত কিলবিল করে একরাশ দড়ি জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কেবল একটিমাত্র দড়ি ছাড়া কারো দড়িই কাঁটার গায়ে পৌঁছল না। আমি সভয়ে দেখলুম সে দড়ি বোঁচকার! ওপার থেকে একটা ভীষণ হর্ষধ্বনি উঠল। দেখলুম বোঁচকা দড়ি ধরে প্রাণপনে টানছে! কিন্তু এখনও সময় আছে—ছেলেরা দড়ি গুটিয়ে নিয়েই আবার ফাঁস ছুঁড়ে মারলে। আমি এবারে আর বয়ার কাঁটার দিকে একটুও তাক করিনি। আমার লক্ষ্য ছিল মাস্তুলের উপর নিশেনটার দিকে। এবারে আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হল। আমার দড়ি গিয়ে নিশেনের ডাঁটা জড়িয়ে ধরলে।

অতি সহজেই এক টান দিয়ে নিশেনটাকে মাস্তুল থেকে ছিনিয়ে নিলুম; বোঁচকার দিকে পড়ে রইল কেবল শূন্য বয়াটা। একটা ‘টাগ-অফ-ওয়ার’ হলনা, বয়া হাতের কাছে এল না, অথচ বিজয়-পতাকা আমারই হাতে পৌঁছে গেল এটা দেখে সকলে একসঙ্গে এতটা

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে একটা তুমুল জয়ধ্বনি ওঠার বদলে সমস্ত ধ্বনিই হঠাৎ যেন কিসের ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে গেল। রেফারী গুড়ুম করে খেলা-শেষের পিস্তল ছুঁড়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রচার করে দিলেন—আমিই জয়ী!

এইবার আস্তে আস্তে আমার চারিদিক ঘিরে একটা কোলাহল পড়ে গেল। আমি হঠাৎ মাটি থেকে প্রায় হাত চারেক শূন্যে উঠে গেলুম। অবাক হয়ে দেখলুম—হেডমাস্টারমশাই আমাকে কাঁধে করে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছেন।

তারপরের ঘটনা আর বেশী বাড়িয়ে বলে লাভ নেই। তবে একটা আশ্চর্য্য ঘটনার কথা না বল্লে গল্পটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হেডমাষ্টারমশাই এক মস্ত ভোজের আয়োজন করেছিলেন। খাবার ঘরে ঢুকে দেখি—কি আশ্চর্য্য! নিমন্ত্রিতদের দলে বসে রয়েছেন বাবা!

বাবা কলকাতার বাইরে নেমন্তন্ন খেতে গেছেন জানতুম—তাই বলে সে যে এখানে তা কে জানত? হেডমাষ্টারমশাই আমাদের পরিচয় শুনে এবং বাবা আমার কীর্ত্তি শুনে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। আমি পকেট থেকে দম্‌দম্ হাই স্কুলের অ্যাড্‌মিশান ফর্মটা বার করে বাবার সামনে ধরে বল্লুম—"এইখানে তোমার একটা সই করে দাও বাবা।"

পঞ্চম অ্যাড্‌ভেঞ্চার

দম্‌দম্‌ ইস্কুলটায় ভর্ত্তি হয়ে মন্দ লাগছিল না—এখানে খেলাধূলো হোতো খুব বেশী। কলকাতার রাস্তায় পাছে গাড়ি চাপা পড়ি এই ভয়ে বাবা আমাকে সাইকেল চালাতে দিতেন না। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই বলে প্রাণ ভরে সাইকেল চালানো যেতো। আমাদের ইস্কুলের ইঁটের রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই প্রকাণ্ড পাচের রাস্তা—তাতে গাড়ি ঘোড়ার ভীড় নেই। মাঝে মাঝে দু একটা মোটর গাড়ি অথবা বাস সোঁ করে চলে যেত এই মাত্র। কলকাতার বাইরে এই খোলা জায়গায় এসে, হাত পা ছুঁড়ে ছুটোছুটি করতে পেয়ে আমার অ্যাড্‌-ভেঞ্চার করবার ঝোঁকটা আর আগের মতো ছিলনা।

আমরা দু তিন জন ছেলে সাইকেলে চড়ে পীচের রাস্তা ধরে অনেক দূর অবধি বেড়াতে যেতুম। একটা জায়গায় আমরা প্রায়ই যেতুম। সেটা ছিল একটা ডাক্তারি ইস্কুল। ঠিক রাস্তার ধারেই একটা কাঁচের সার্সি দেওয়া ঘর ছিল—এই ঘরটাকে দূর থেকে দেখলেই আমাদের কেমন ভয় ভয় করত, অথচ সেই সার্সি দিয়ে

ভিতর দিকটায় একবার উঁকি মারবার জন্যে একটা বিষম লোভও হত। উঁকি মেরে দেখতে পেতুম ঘরটার ভিতর নানা রকমের অদ্ভুত কল রয়েছে, সে সব কল যে কিসের জন্যে, কাদের জন্যে এবং কি কাযে লাগে তা হাজার মাথা ঘামিয়েও আমরা বার করতে পারতুম না। ডাক্তারি ইস্কুলের ছেলেরা কখনো কখনো এসে দু'একটা কল চালাতো। একটা হাপর ছিল, সেটা ঠেলতে আরম্ভ করলেই একটা চোঙা দিয়ে বিষম তোড়ে নীল রংএর আগুন বেরিয়ে আসত। একটা কাঁচের ফ্রেমের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলত, অথচ ঘড়ি টড়ি কিছুই ছিলনা—কেন যে খামকা সেটা দুলছে, এটা আমাদের ভারি আশ্চর্য্য লাগত। একদিকে একটা টেবিলে একসারি জলভরা সবুজ রংএর কাঁচের বুয়াম সরু সরু তার দিয়ে এটায় ওটায় যোগ করা থাকত। আমরা বলাবলি করতুম, ওটা নিশ্চয় একটা টেলিফোন। এমনি আরো নানা রকম বেরকমের জিনিস ছিল—যা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতুম, কিছুই বুঝতে পারতুম না।

এমনি ভাবে আমরা প্রায়ই সার্সির বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখতুম—কোনদিন সাহস করে ভিতরে ঢুকিনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাও আমাদের কপালে জুটে গেল। সেদিন আমরা দু'তিন জন বাইরে থেকে উঁকি পাড়ছিলুম, ভিতরে একটি চশমা-পরা বাবু হাতের

আস্তিন গুটিয়ে কাজ করছিলেন, তিনি আমাদের দেখে এগিয়ে এসে কাঁচ-বাঁধানো দরজাটা খুলে আমাদের ভিতরে ডাকলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমটা আমার ভারি ভয় হয়েছিল। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি তারাও মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। তারপরই বড় লজ্জা হল, এই সাহস নিয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে গিয়েছিলুম? আমি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলুম—বন্ধুরাও পিছনে পিছনে এল।

সেই চশমা পরা বাবুটি আমাদের একটা প্রকাণ্ড গামলার কাছে নিয়ে গেলেন। গামলার জলের মধ্যে দুটো জল-ভরা বোতল উপুড় করা রয়েছে। জলের মধ্যে ডোবানো দুটো তার—তাদের মুখ থেকে অনবরত বুদ্বুদ বেরিয়ে সেই বোতল দুটোর মধ্যে জমা হচ্ছে। আমার সঙ্গীরা যতক্ষণ অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখছিল আমি তখন একটা দরজা ফাঁক করে পাশের ঘরটায় কি আছে তাই দেখতে গেলুম। কিন্তু যা দেখলুম, তাতে আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। ঘরটা নানা রকমের ওষুধ ভরা কাঁচের শিশিতে ঠাসা, দেয়ালের গায়ে গায়ে বড় বড় ছবির বই ঝুলছে—তার কতকগুলোতে মানুষের দেহের নানা রকম ছবি আর বাকিগুলোতে কি যে হিজিবিজি আঁকা রয়েছে কিছুই বুঝলুমনা। কতকগুলো বুয়ামে হলদে রংএর জলে টিকটিকি, বিছে, সাপ,

সজারু, অদ্ভুত মাছ, নানা রকমের পোকা ডোবানো রয়েছে। একটা টেবিলের ধারে দুজন ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজনের হাতে একটা জ্যান্ত ব্যাং আর একজনের হাতে একটা ছুরি! ব্যাংটাকে ফ্যাঁস্ করে তারা আধখানা করে কেটে ফেল্লে। খানিকক্ষণ নড়ে চড়ে তার দেহ স্থির হয়ে গেল। তখন সেই ব্যাংএর দু'টুক্রো দুখানা লোহার শিকের উপর টাঙিয়ে দিলে। তারপর যে কি করলে কিছুই বুঝলুম না—হঠাৎ ব্যাঙের ঠ্যাং চারটে রীতিমত এদিক ওদিক লাফাতে লাগল! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা দায় হয়ে উঠল। আমি ভাবলুম —এইবার বোধহয় টুকরো দুটোকে জোড়া দিয়ে দেবে। একটু ভাল করে দেখব বলে দরজাটা ফাঁক করতে যাচ্ছি এমন সময় সেই চশমা পরা বাবুটি হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠলেন—"ওহে ওদিকে যেওনা, এখানে এসো।"

আমি থতমত খেয়ে চলে এলুম। ততক্ষণে বোতল দুটো হাওয়াতে প্রায় ভরে এসেছে! বাবুটি বোতল দুটো খানিকক্ষণ ওলোট পালট করলেন, খানিকক্ষণ ঝাঁকালেন, তারপর একটা বোতলে ছিপি এঁটে একটা তোয়ালে দিয়ে মুড়ে আমাদের বল্লেন—"এসো।"

কি হয় দেখবার জন্যে আমরা সেই যেখানে তোড়ে নীল রংএর আগুন বার হত সেইখানে গেলুম। সবেমাত্র সেখানে গেছি, এমন সময় কি হল কিছু

বোঝবার আগেই—হুড় দড়াম্—করে একটা ভীষণ কান ফাটানো শব্দ—মনে হ'ল যেন ঘরটা শুদ্ধু ভেঙে পড়ল! আমরা ভয়ে চমকে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম—বুকে হাত দিয়ে দেখি বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে—আর সেই বাবুটি নাক থেকে চশমাটা খুলে নির্লজ্জের মতো হো হো করে হাসছেন। দরজা খুলে দিয়ে তিনি আমাদের বেরিয়ে যেতে বল্লেন—আমরা বোকার মতো আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লুম।

সেদিনকার ঘটনা নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা হয়েছিল। আমি কিন্তু সে আলোচনায় বেশী যোগ দিই নি—আমার কেবলই মনে হচ্ছিল সেই ব্যাংটার কথা—কি অবাক মন্তরে কাটা ব্যাংকে এরা বাঁচিয়ে দিলে, এটা যত ভাবছিলুম, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম।

ছেলেরা সেই চশমা-পরা বাবুটির উপর বিষম চটে গিয়েছিল। তারা হলো দমদমার নামজাদা ডানপিটে ছেলে—কোন রাজা রাজড়ারও তোয়াক্কা রাখেনা—তাদের কিনা ঘরের ভিতর ডেকে অমনি করে অপমান! ছেলেরা ক'জনে মিলে ঠিক করলে—এর শোধ নিতেই হবে। চশমা-পরা বাবুটিকে রোজই কলকাতায় যেতে হয়। রাস্তায় সুবিধা পেলেই আচ্ছা করে পিট্টি দেওয়া হবে। আমাকে শুদ্ধ তারা দলে টানতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হলুম না।

আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল—ঐ কাটা ব্যাং জোড়া দেওয়া কলটার কথা। ব্যাংএর টুকরো দুটোকে লাফাতে দেখে এসেছি—কিন্তু তারপর কি হল? তারপর তো আমার আর দেখা হয়নি। চশমা-পরা বাবুটি ধমক দিয়ে হঠাৎ ডেকে নিলেন—কিন্তু আমার মনটা—শেষটা কি হয় দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল। হয়ত ব্যাংএর টুকরো দুটো জোড়া লেগে গেছে কিংবা হয়ত দুটুকরো থেকে দুটো ব্যাং হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই একটা কিছু অতি-অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমার মন ভারি অস্থির হয়ে উঠছিল। আমি ভাবলুম, অন্ধকার হলে যখন সবাই চলে যাবে, সেই সময় একবার চুপিসাড়ে পারি তো ব্যাংএর ঘরে ঢুকে কলটাকে ভাল করে দেখে আসব। এই ভেবে সেদিন ইস্কুল ছুটি হবার পরও আমি দমদমায় রয়ে গেলুম।

তখন সূর্য্য ডুবে গেছে। সার্সি-দেওয়া ঘরটার সামনে এসে দেখলুম কেউ কোথাও নেই। সাহসে ভর করে কাঁচের দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেললুম। ফুস্‌ করে খুলে গেল। ঘরটার মধ্যে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছি, এমন সময় সেই ব্যাংএর ঘরের দরজাটা হঠাৎ একটা মচ্‌ আওয়াজ করে খুলে গেল। আমি একটু লুকোবার মতো জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগেই আমি ধরা পড়ে গেলুম। দেখলুম সকালবেলা যে চশমা-পরা বাবুটি

আমাদের ভীষণ আওয়াজ শুনিয়ে চম্‌কে দিয়েছিলেন ইনি সেই। কিন্তু তারপরই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। বাবুটি আমায় দেখেই হঠাৎ ভয়ে ছুটে ব্যাংএর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটা কৌতুহল হল—ভাবলুম—ব্যাপারটা কি দেখাই যাক্। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলতে লাগলুম। বুঝলুম দরজা ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। কি করব ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল দেয়ালের কোনে একটা যে ঘুলঘুলির মতো ছিল তারই ভিতর দিয়ে সেই বাবুটির চশমা-পরা চোখ জোড়া আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখ পড়তেই তিনি তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। ভাবলুম লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি ?

ব্যাংএর ঘরের দরজা বন্ধ, কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় ? ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। ডাক্তারি ইস্কুলটা কোন দিন দেখিনি। ঠিক করলুম একটু পায়-চারি করে ঘুরে দেখা যাক ; তারপর আর একবার এসে ব্যাংএর ঘরের চেষ্টা করা যাবে। ইস্কুলটা যে এত বড় তা এর আগে কখনো জানতুম না। দু' তিনটে বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখলুম। এক একটা বাড়িতে এক একটা সাবজেক্ট পড়ানো হয়। তারপর অন্য একটা দোতলা বাড়ির দিকে যাচ্ছিলুম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। তার উপর রাস্তার দুপাশের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া

কয়েকটা গাছের ছায়ায় আরো বেশী অন্ধকার বোধ হচ্ছিল। গাটা যে একটু ছম্ ছম্ করছিল না একথা অস্বীকার করবনা। এমন সময় আমার পিছনে যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম—শুকনো পাতার উপর পা পড়লে যেমন খস্ খস্ শব্দ হয় ঠিক তেমনি। আমি চম্‌কে উঠে পিছনে তাকালুম। মনে হল যেন একটা সাদা ছায়া হঠাৎ গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কি ওটা ? মানুষ না আর কিছু ? পাশেই হাসপাতাল। কতরকমের লোক দিনরাত মরছে তার ঠিক নেই। মনে সাহস আনবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। জোরে জোরে পা চালিয়ে সে রাস্তাটুকু কোন রকমে পার হয়ে গেলুম—কিন্তু পিছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না। দোতলা বাড়িটার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়ালুম। কেউ কোথাও নেই। দরজা জানলা সমস্ত বন্ধ। ভাবলুম ফিরব ? কিন্তু ঐ সর্ব্বনেশে রাস্তাটা ছাড়া তো আর ফেরবার পথ নেই। ব্যাংএর কল দেখা তখন আমার মাথায় চড়েছে—

এমন সময় হঠাৎ কে আমায় পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরলে ! আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল ! বুঝলুম, নিশ্চয় আমার ভূতে ধরেছে। কিন্তু ভূতটা "গদাই, গদাই" বলে মানুষের মত গলায় ভীষণ চ্যাঁচাতে লাগল ! একটু পরেই বাড়িটার পিছন থেকে দু'হাতের আস্তিন গোটানো,

মোটা সোটা একটি লোক ছুটে এলেন। আমায় যিনি ধরে ছিলেন, তিনি বল্লেন—“ধর্‌তো গদা ছোঁড়াটাকে।”

গদাই আমায় বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধর্‌ল। আমি পিছন ফিরে দেখলুম—সেই চশমা-পরা বাবুটি! এরকম আশ্চর্য্য মানুষ তো আমি কখনো দেখিনি! আমায় দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকা, তারপর অতর্কিতে জাপ্‌টে ধরা, আর ঐ সরু রাস্তার উপর গাছের আড়ালে সাদা ছায়ার মতো মিলিয়ে পড়া, সে-ও নিশ্চয় এঁরই কায—কিন্তু এ সবের মানে কি?

যাই হোক, এরা আমায় একটা বারান্দার ধারে নিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ধাক্কা মেরে একটা কুঠরীর মতো ঘরের মধ্যে ফেলে দড়াম্‌ করে দরজা বন্ধ করে দিলে। বেশ স্পষ্ট শুনলুম—কড়াক্‌ করে চাবির কল পড়ে গেল! ঘরের ভিতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা, আমার হাত পা সমস্ত হিম হয়ে এল।

শুনলুম চশমা-পরা বাবুটি গদাইএর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বারান্দা দিয়ে চলেছেন। চশমা-পরা বাবুটি বলছেন—“জানিস্‌ গদা, এই দম্‌দম্‌ স্কুলের ছেলেগুলো আজকাল বড় বেড়ে উঠেছে। আজ বিকেলে কলেজ থেকে সবে বেরিয়েছি, এমন সময় ক’টা ছেলে এসে আমায় ধরে আচ্ছা করে মার দিয়ে গেল। ঐ ছোঁড়াটা ওদেরই দলের। নিশ্চয় চর হয়ে এসেছিল। খুব

বাগে পাওয়া গেছে, কি বলিস ?" গদাই বল্লে—"তাই নাকি রে ?" কথার শব্দ কমতে কমতে শেষটা মিলিয়ে গেল। অমি সেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে একা পড়লুম। ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। ছেলেরা আজই তাদের অপমানের শোধ নিয়েছে ! চশমা-পরা বাবু যে ব্যাংএর ঘরে দোর দিয়েছিলেন নিশ্চয় এই ভেবে, যে আমরা আবার একদল ছেলে নিয়ে তাঁকে মারতে গেছি। কিন্তু ছেলেদের সব দায় দোষ একা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল—এ কি বিপত্তি !

ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে আমার শীত করতে লাগল। উঠে দাঁড়াতে যাবো, পায়ে একটা কি ঠেকে হুমড়ি খেয়ে কিসের উপর পড়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে "ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও ঘ্যাস্ ঘ্যাস্" করে একটা বিদঘুটে শব্দে ঘরটা কেঁপে উঠল ! আমি যে জিনিষটার উপর পড়ে গিয়েছিলুম—দেখি সেটা একটা মৃতদেহ ! কিন্তু মড়া কি শব্দ করে নাকি ? মরা মানুষ কি জ্যান্ত-মানুষকে ভয় দেখায় ? কাঁপতে কাঁপতে একটা দরজার কাছে গিয়ে বসে পড়লুম। দরজাটা যেন আলগা ঠেকল। তাইত, একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। এদিকের দরজাটা বন্ধ করতে ওরা বোধহয় ভুলে গেছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কানের মধ্যে তখনও আমার "ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও ঘ্যাস্ ঘ্যাস্" শব্দটা বাজছিল।

ঐ সামনের ঘরটার ভিতর কি আছে কে জানে! একটা স্যাঁতসেতে মেঝে। কোন জায়গা উঁচু, কোন



জায়গা নীচু! হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা চলেই আমি হঠাৎ থমকে বসে পড়লুম। সামনেই চোখে পড়ল—

মাটি থেকে একহাত উপরে শূন্যে একটা নরকঙ্কাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রথমটা গা'টা একটু শিউরে উঠেছিল, কিন্তু তারপরই মনে মনে বল্লুম—ডাক্তারি ইস্কুলে একটা কঙ্কাল থাকবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? বেশ একটু সাহস করেই তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে খড় খড় খড় খড় করে সমস্ত কঙ্কালটা নড়ে উঠল। বাস্! আমার চোখ কান হাত পা সমস্ত অবশ হয়ে এলো।

কেমন করে যে চৌকাঠ পার হয়ে একটা প্রকাণ্ড হলের মত ঘরে গিয়ে পড়লুম তা আমি নিজেও টের পাইনি। কিসের একটা ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে একটা আঁষটে গন্ধ মাথার মধ্যে ঢুকে সব যেন কেমন গোলমাল করে দিলে। হাতড়ে চলতে গিয়ে আবার একটা কিসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। হাত বুলিয়ে দেখি টেবিলের উপর একটা মড়া শুয়ে রয়েছে। চম্‌কে উঠে অন্য দিকে পা বাড়ালুম। সেদিকেও আর একটা মড়া। যেদিকে যেতে চাই চতুর্দ্দিকেই মড়া। সেই আবছায়া অন্ধকারে ভাল করে চেয়ে দেখলুম সমস্ত ঘরটার মধ্যে রাশি রাশি মড়া গিস্ গিস্ করছে—তারা কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কারো মাথা নেই, কারো হাত পা কাটা, কারো সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন বিছিন্ন! আমি সেই ঘরের মেঝেয় ধপ্ করে বসে পড়লুম। আমার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

মনে হতে লাগল—যেন আমার চারপাশে কারা অতি সন্তর্পনে নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন মৃতদেহ গুলো ধীরে ধীরে তাদের টেবিলের শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার চারিদিক ঘিরে ফেলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

কতক্ষণ এ রকম ছিলুম জানিনা। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরের কোনে একটা নীল রংএর পর্দ্দার আড়াল থেকে যেন একটা ক্ষীণ আলোর রেখা আসছে। এতক্ষণে আলো দেখে মনে একটু বল পেলুম। পা টিপে টিপে চল্লুম সেইদিকে এগিয়ে। পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে সেই মিটমিটে আলোয় চোখে পড়ল দু'খানা লোমশ হাত, এক হাতে একটা ছুরি, অন্য হাতে একটা সাঁড়াশি নিয়ে একটা মড়াকে কাটছে!

গদাইএর গলার শব্দ পেলুম! পর্দ্দাটা হাতে করে একটু ফাঁক করে দেখলুম; গদাই আর সেই চশমা-পরা বাবুটি একটা মড়াকে প্রায় কোলের উপর টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটছেন। গদাই বলছিল—"ওরে সে ছোঁড়াটার কি হল একবার দেখ্।"

চশমা-পরা বাবুটি বল্লেন—"থাক্ না এখন। বেশ খানিকটা শিক্ষা হোক।"

গদাই বল্লে—"একে তো পেট-ফাঁপা মড়ার ঘরে রেখে এসেছিস্, তারপর যদি মড়াটা ফোঁস্ ফোঁস্ করে, আর ছোঁড়াটার দাঁত কপাটি লেগে যায় তাহলেই চিত্তির।"

চশমা-পরা বাবুটি বল্লেন—"তাইত রে, এ কথাটা তো এতক্ষণ মনে হয়নি। সে ছোঁড়াটা ছেলেমানুষ—যদি ভয়ের চোটে অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে পড়ে তাহলে এক দায় করবে দেখছি।"

গদাই বল্লে—"সেদিন সেই স্কেলিটনের ভিতর ইঁদুর ঢুকে খড় খড় শব্দ করে যদু ক্লার্ককে কি রকম ভয়টা দেখিয়েছিল—মনে আছে ?"

চশমা-পরা বাবুটি বল্লেন—"মনে নেই আবার ? চল্ চল্ একবার দেখা যাক ছোঁড়াটার কি হল। দু'চার পাক কান মলে ছেড়ে দেওয়া যাবে—চল্।"

তারা ওঠে দেখে আমি আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার রাত—কোনদিকে চলেছি কিছুই জানিনা। অনেকক্ষণ চলবার পর কতকগুলো কাঁটার ঝোপ ঝাড় ভেঙে একটা পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ালুম। ওপারে একটা মিটমিটে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে কে যেন ছিপ্ ফেলে মাছ ধরছে বলে বোধ হল্। আর এপারে একটা বটগাছ ছিপের মতো সরু সরু ঝুরি জল অবধি নামিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—কোনদিকে গেলে বড় রাস্তায় পড়া যায়।

এমন সময় "চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ—চি হিঁ হিঁ—শব্দে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা কেঁপে উঠল। আর বেশ স্পষ্ট

শুনলুম খটাখট্ খটা খট্ খটা খট্ করে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাক্তারি ইস্কুলের পিছনেই একটা গরু ঘোড়ার হাসপাতাল আছে শুনেছিলুম। সেখানে ঘোড়া-ভূতের ভয়ে কেউ দিনের বেলায়ও যেতে সাহস করতনা। আমি কি এই সন্ধ্যের অন্ধকারে সেই ঘোড়া ভূতের আস্তানায় এসে পড়লুম নাকি? ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবছিলুম—এইবার হয়তো দেখব—একটা মানুষের কঙ্কাল একটা ঘোড়ার কঙ্কালের উপর চড়ে টগ্ বগ্ করে ছুটে আসছে! সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম ওপারে সেই লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছে। ছিপ-হাতে একটা কি বসে আছে বটে—কিন্তু লোকে তো দিনের আলোতেই মাছ ধরে; এই রাত্তির বেলার ঘুরঘুট্টী অন্ধকারে মাছ ধরছে এ কে?

হঠাৎ কিট্ কিট্ কিট্ কিট্ ছিপের সুতো ছাড়ার আওয়াজ পেলুম। একটা মাছ গেঁথেছে বোধ হয়। ওপারের লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দের চোটে— "গেঁথেছে, গেঁথেছে"—বলে চীৎকার লাগিয়ে দিলে!

কিট্ কিট্ কিট্ কিট্—কিট্ কিট্ কিট্ কিট্—

মানুষের গলার শব্দ শুনে আমার তখন ভূতের ভয় ভেঙে গেছে। গলাটা যেন চেনা চেনা বোধ হল। আমি এক দৌড়ে ওপারে গিয়ে দেখলুম—তাইত, এ যে

বাবা! এই অন্ধকারে মাছ-মারতে এসেছেন—উঃ সখ্ কম নয় তো! ঘোড়ার খুরের যে শব্দটা পাচ্ছিলুম—সেটা ঠিক আমাদের পিছনে এসেই থেমে গেল। পুকুরের ধারে গাছের বেড়া—তার ওপারেই বড়-রাস্তা—এতক্ষণ অন্ধকারে কিছুই টের পাইনি। দেখি, সেখানে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

বাবা হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে বল্লেন "আরে বাবুই যে। শীগ্গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্—দেড়-মনি মাছ পড়েছে।"

আমি বল্লুম—"ডাক্তারবাবু কে?"

বাবা বল্লেন—"আরে ঐ যে গাড়ি-করে এসেছেন, ডেকে আন্ না।"

বুঝলুম এই ডাক্তারবাবুর পুকুরেই মাছ ধরতে আসা হয়েছে। কিন্তু হায় রে! ডাক্তারবাবু আসতে আসতেই বাবার দেড়-মনি মাছ স্থতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু খুব খানিকটা হাসলেন। বাবা আমাকে শুধোলেন—"তুই এখানে কি করে এলি রে? ফের অ্যাড্ভেঞ্চার সুরু করেছিস্ বুঝি?"

ডাক্তারি-ইস্কুলের ব্যাপারটা ডাক্তার বাবুর সামনে বলতে কেমন লজ্জা করতে লাগল। আমি বল্লুম—"নাঃ এমনি!"

ষষ্ঠ অ্যাড্‌ভেঞ্চার

বাড়ি ফিরে এসে বাবা একটু ঠাট্টা করে বল্‌লেন,—"কি অ্যাড্‌ভেঞ্চার হল ?"

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ অ্যাড্‌ভেঞ্চার একটা হয়েছে বটে অযাচিত রকমের।" ব্যাপারটা খুলে বল্লুম। বাবা শুনে বল্লেন—"তারপর ? এখন কি করা হবে ?"

আমি বল্লুম—"আমি আর দমদমার ইস্কুলে যাবোনা। পূজোর ছুটির-ও তো আর দেরী নেই। চল তোমরা দার্জ্জিলিং যাচ্ছ তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আসি।"

বাবা বল্লেন—"হ্যাঁ দার্জ্জিলিং জায়গাটা অ্যাড্‌ভেঞ্চা-রের খুব উপযুক্ত বটে। সামনেই ফালুট, তারপর বরফের পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘা, ইচ্ছে করলে পাহাড় টপ্‌কে ওপারে তিব্বতেও যাওয়া যেতে পারে।"

আমি বল্লুম—"না তা নয়। আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি দেখেছি। একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।"

আমার দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির হয়ে গেল।

সেবার দার্জ্জিলিং-যাত্রীর বড় ভিড়। পূজোর ছুটির আগে থেকেই দলে দলে লোক পাহাড়ে বেড়াতে

চলেছে। অনেক হাঙ্গামা করে তবে আমরা একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করতে পারলুম। ভিড়ের জন্যে প্রায় পাঁচ খানা স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছিল। আমরা দুই নং স্পেশালে সন্ধ্যা সাতটার সময় আমাদের ট্রেনে উঠলুম। সকলেই বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিলেন কিন্তু আমি তা করিনি। চল্‌তি ট্রেনে খাবার খেতে আমার ভারি আনন্দ হয়। আমার সমস্ত খাবার বেঁধে ছেঁদে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। গাড়ি ছেড়ে দিতেই আমি আমার পুঁজিপাটা খুলে বসলুম। খাবার সমস্তই ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছিল—তা হলেও আমার মুখে তা অমৃতের মতো লাগতে লাগল।

রানাঘাট পার হয়ে যাবার পর আমরা যে যার বিছানা পেতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার কিন্তু ঘুম আর আসেনা। জানলা দিয়ে অন্ধকার আকাশটা এক মুঠো তারা নিয়ে আমাদের টেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে—চোখ চেয়ে এই ছবি দেখছি, চোখ বুজেও তাই দেখছি। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে একটা গ্যাসের তীব্র আলো কামরার মধ্যে ঢুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চাকার আওয়াজে টের পাচ্ছি ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে—একটা ষ্টেশান এলো। ষ্টেশানে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকাটা ভারি বিশ্রী লাগে—কেবলই মনে হয়—চল্লে বাঁচা যায়। শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগেনা, উঠে বসলুম।

অনেক রাতে আমাদের ট্রেন পদ্মা নদী পার হল। এই ব্রীজটাও আমার দেখবার ভারি ইচ্ছে ছিল। তাড়াতাড়ি দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। এত প্রকাণ্ড নদী এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আকাশে চাঁদ নেই, কেবল তারার আলোয় এপার থেকে ওপার অবধি সমস্ত জলটা যেন ঝল্‌মল্‌ করছে।

ঈশ্বরদি ষ্টেশানে এসে আমাদের গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাবারা এতক্ষণ পাখার হাওয়ায় দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছিলেন। গরমের চোটে তাঁদেরও ঘুম ভেঙে গেল! গাড়ি আর ছাড়ে না দেখে আমি বিরক্ত হয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে পায়চারী করতে লাগলুম। হাঁটতে হাঁটতে বড় তেষ্টা পেতে লাগল। প্ল্যাটফরমের একপ্রান্তে সোডার দোকান, ভাবলুম চট্‌ করে একটা খেয়ে আসি। এই ভেবে সেইদিকে খানিকটা গেছি, এমন সময় ঢং ঢং করে রেল ছাড়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। আমার আর সোডা খাওয়া হল না, দৌড়ে গিয়ে আমাদের কামরায় উঠে পড়লুম। আঃ এতক্ষণে বাঁচা গেল— গাড়ি ছেড়ে দিলে। ঠাণ্ডা মেঠো হাওয়ায় আমার তেষ্টা কোথায় মিলিয়ে গেল টের পেলুম না। কিন্তু আমার চোখে তবু ঘুম নেই।

আবার একটা ষ্টেশান। দরজা খুলে প্ল্যাটফরমে নেমে দাঁড়ালুম। দূরে চোখে পড়ল একটা ফিরিওয়ালা এক

ঝুড়ি সোডা লেমনেড মাথার কাছে রেখে শুয়ে রয়েছে। দেখেই তেষ্টাটা আবার যেন চেগে উঠল। ভাবলুম, যাই একটা চট্ করে লেমনেড খেয়ে আসি। তার কাছে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে তুলে বল্‌লুম "দেখি একটা লেমনেড।" সে চোখ বুজেই বল্লে—"লিম্‌নেড তো নেহি—সোডাবাটার আছে।"

আমি বল্লুম—"তাই দাও।" ঢুলন্ত অবস্থাতেই সে হাৎড়ে একটা বোতল বার করে ছিপি খুলে আমার হাতে দিলে। একঢোক মাত্র সোডা খেয়েছি এমন সময় হঠাৎ গার্ড সাহেবের সিটি পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি বোতলটা ফেলে রেখে দৌড় দিলুম। লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—"বাবু পয়সা—"

হুঁ এতক্ষণে ব্যাটা চোখজোড়া পুরোপুরি খুলেছে। আমি একটু থেমে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে তার দিকে ছুঁড়ে ছুটলুম। গাড়ি ততক্ষণে নড়তে আরম্ভ করেছে। আমাদের কামরা ছেড়ে আমি অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছিলুম—প্রায় ট্রেনের শেষে। ছুটতে ছুটতে কয়েকটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা পেরিয়ে গেলুম—কিন্তু সেগুলো আমাদের নয়। মনে হল আরো আগে আমাদের কামরা—আবার ছুটলুম। কিন্তু এবারেও ধাঁধা লেগে গেল। মনে হল হয়ত পিছনে ফেলে এসেছি। কি করা যায়—ততক্ষণে গাড়ি একটু জোর

দিয়েছে। ছুটোছুটিতে যেন আরো বেশী নার্ভাস্ হয়ে পড়লুম—যা হয় একটা গাড়িতে যে উঠে পড়ব—সে বুদ্ধিও মাথায় এলনা। তা ছাড়া চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠতে সাহসও হলনা। শোঁ শোঁ করে গাড়ি প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম ট্রেনের পিছনে গার্ডের ঘরের লাল আলোটা এঁকতে বেঁকতে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলেছে!

তাইত, এখন কি করা যায়? সঙ্গে যথেষ্ট পয়সা কড়িও নেই যে ভোরের গাড়িতে দার্জ্জিলিং যাবো কি বাড়ি ফিরে যাবো। ভাবলুম ষ্টেশান-মাস্টারকে একবার ব্যাপারটা জানান যাক।

ষ্টেশান-মাষ্টারকে বলতে সমস্যাটার অতি সহজেই সমাধান হয়ে গেল। মাষ্টারমশাই ভারি ভদ্রলোক। আমাকে ছেলেমানুষ দেখে তাঁর হয়ত দয়া হয়ে থাকবে, কিংবা আমাকে খুব চট্‌পটে দেখে তিনি হয়ত খুসী হয়ে থাকবেন, সে যাই হোক তৎক্ষণাৎ আমার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। বল্লেন, আধ ঘণ্টা বাদেই তিন নং স্পেশাল এসে সেখানে পৌঁছবে। তাতে আমাকে তুলে দেবেন। সকালবেলা শিলিগুড়িতে আমার সঙ্গে আমার অভিভাবকদের দেখা হবে। তিনি টেলিফোন করে রাখবেন যাতে শিলিগুড়িতে আমার বাবা আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

আধঘণ্টা বাদে তিন নং স্পেশালে মাষ্টারমশাই আমাকে এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তুলে দিলেন।

গাড়ির প্রত্যেকটি গদীতেই একজন করে শুয়েছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে একজন আমাকে তাঁর পাশে জড়সড় হয়ে শুতে জায়গা দিলেন। একে তো ট্রেনে আমার ঘুমই হয়না, তার উপর এমনি অসুবিধের মধ্যে শুয়ে কিছুতেই আর চোখের দু-পাতা এক করতে পারলুম না। অপর সকলে দেখলুম বেশ নিদ্রা দিচ্ছেন।

দেখতে দেখতে অনেক রাত কেটে গেল। কি একটা ষ্টেশানে গাড়ি ঢুকছে। ভাবছি, দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ষ্টেশানের ঘড়িটা দেখব? এমন সময় খটাং করে দরজাটা খুলে গেল, দেখলুম জটা মাথায় একজন সাধু হেলতে দুলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। ষ্টেশান-মাষ্টারমশাই যাবার আগে দরজার খিলটা ভিতর থেকে এঁটে দিতে বলে গিয়েছিলেন, যাতে বাইরে থেকে কেউ না খুলতে পারে—আজকাল চোর বাটপাড়ের যা ভয়। খিলটা আমি নিজের হাতে এঁটে দিয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি রেলকোম্পানীর খিলগুলো একেবারে বাজে।

সাধুকে উঠে আসতে দেখে আমার ভারি বিরক্তি লাগল; বলে উঠলুম—এখানে আর জায়গা নেই।" আর সকলে দেখলুম, গভীর নিদ্রা দিচ্ছেন, কেউ কোন সাড়া দিলেনা। সাধু কোন জবাব না দিয়ে দরজার খিলটা বন্ধ

করে একটা বেঞ্চিতে একজনের পায়ের কাছে বসে পড়লেন।

আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। চোর ছ্যাঁচড়রা এই রকম সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায় আমি জানি। এখানে এতগুলি ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁদের জিনিস পত্র রয়েছে, ব্যাটা সাধু কোন ফাঁকে কার জিনিস নিয়ে সরে পড়বে কে জানে? আঃ ভদ্রলোকেরা এমন বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছেন। আমি চুপি চুপি আমার বেঞ্চির ভদ্রলোকটিকে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। তিনি কোন সাড়া দিলেন না।

সাধু আমার দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বল্লেন—"জাগবেনা।" আমি চম্কে উঠলুম। কি বল্লে? জাগবেনা? ব্যাটা মন্তর করলে নাকি? নাঃ কিছুতেই নয়, ভদ্র-লোককে জাগাতেই হবে। জোরসে এক ঠেলা দিলুম। কিন্তু ভদ্রলোক যেন অজ্ঞান! সাধুর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালুম। সে তখনও সেইরকম ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

সাধুকে যে চোর ভেবেছিলুম তার জন্যে আমার ভারি ভয় হতে লাগল। কে জানে আমার মনের কথা টের পেয়েছে কিনা। যাই হোক সাধু সে সব কিছুই বল্লেন না, খানিক পরে বল্লেন—"তোমার যখন এতই কৌতুহল, তাহলে বলি। এই ট্রেনে আমি উঠেছি আমায় এক

জায়গায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে। দরজায় একটা খিল দেওয়া ছিল—ওটা আমি ইচ্ছা-শক্তির বলে খুলে ঘরে ঢুকেছি। আর ট্রেনটা বড়—আস্তে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করাতে ট্রেনের গতি প্রায় চারগুণ বেড়ে গেল। বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার উঁকি মেরে দেখ তো।"

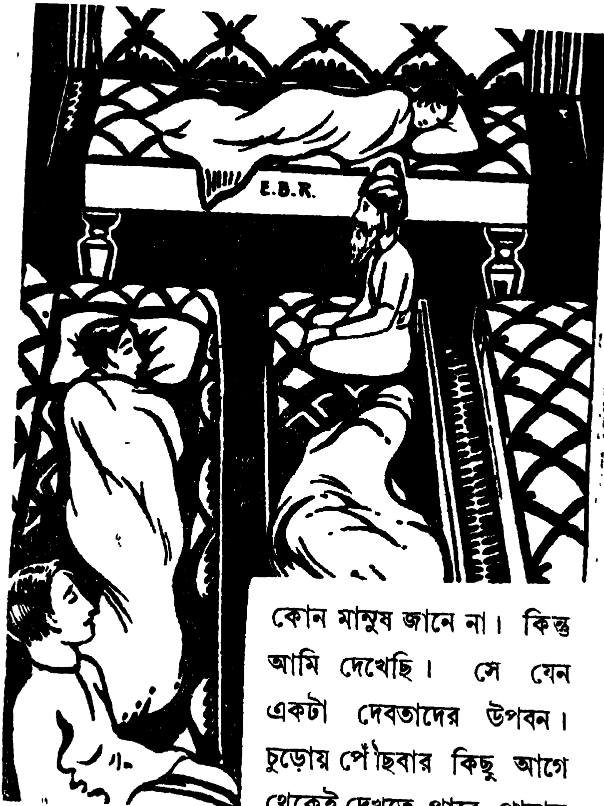
আমি তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি রেলের লাইনে চাকার শব্দ দ্রুততর হতে উঠেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার মুখে আর কথা সরল না। এত জোরে ট্রেন ছুটে চলেছে যে বাতাস এসে ছুরীর মতো লাগছে।

সাধু বলে চললেন—"এ গাড়ি শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমি একে ব্রাঞ্চ-লাইন দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। এতে আমার সর্টকাট হবে। বতুঙ্গ পাহাড়ের নাম শুনেছ?"

আমি বল্লুম—"না।"

সাধু বল্লেন—"সত্যিই তো তুমি কোত্থেকে শুনবে। সে যাই হোক—সেই বতুঙ্গ পাহাড়ের চূড়োয় কাল সকালের মধ্যে আমায় পৌঁছতে হবে। পাহাড়টা চার হাজার ফিটের বেশী যে উঁচু অ নয়—কিন্তু এত খাড়াই আর এত পিছল ষে কোন মানুষই তার উপর উঠতে পারে না। আমার এক পথ জানা আছে, সেই পথে আমি উঠব। আশা করছি সূর্য্য ওঠরার সঙ্গে সঙ্গে চূড়োয়

পৌঁছতে পারব। অমন সুন্দর পাহাড় পৃথিবীতে আর দুটি নেই। পাহাড়ের চূড়োয় কি আছে



কোন মানুষ জানে না। কিন্তু আমি দেখেছি। সে যেন একটা দেবতাদের উপবন। চুড়োয় পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই দেখতে পাবে পাহাড় ঘিরে চারিদিক থেকে ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা উঠছে, তার তলায় লাখে লাখে পাখী আর এত

রঙিন পাথরের নুড়ি—কোনগুলো পাখী, কোনগুলো নুড়ি তুমি ধরতেই পারবে না। চূড়োয় পৌঁছে দেখবে ফুলের রাজ্য—সেখানে সারা বছর ফুল ফোটে। চূড়োটা একটা প্রকাণ্ড ঢালু মাঠের মত, সেখানে ফুলের বন ছাড়া আর কিছু নেই। ফুলবনের মধ্যে দিয়ে রঙিন নুড়ি ফেলা রাস্তা আছে—পাথরের নুড়ির যে এমন রং হয় তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দেখে মনে হবে যেন মানুষের তৈরী রাস্তা কিন্তু আসলে সরু সরু জলের স্রোতে নুড়ি জমে জমে এই রাস্তা তৈরী হয়েছে। আমি একটা রাস্তার নাম দিয়েছি ফিরোজায়ন! —ফিরোজা রংএর নুড়িতে এই রাস্তা হয়েছে। ফিরোজায়ন দিয়ে কিছুদূর গেলেই প্রকাণ্ড একটা হ্রদ পাবে। সে হ্রদ এত সুন্দর যে তার ধারে বসলে মনে হয় না আর ফিরে আসি। সেইখানে আমায় যেতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি এই ট্রেনে উঠে পড়েছি।”

আমি বল্লুম—“কোন ষ্টেশানে আপনি নামবেন?”

—“রাহাকোট—ব্রাঞ্চ লাইনের উপর পড়বে। ঠিক বতুঙ্গ পাহাড়ের তলায়। সেখানে নেমে তোমাদের ট্রেন আবার আমি ছেড়ে দেব—ঠিক সময় তোমরা শিলিগুড়িতে গিয়ে পৌঁছবে।”

আমি বল্লুম—“সাধুজী! বতুঙ্গ পাহাড়টা দেখবার আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে। আমাকে সঙ্গে নেবেন?”

সাধু বল্লেন—"অনায়াসে। কিন্তু পাহাড়ে ওঠবার কষ্ট সইতে পারবে তো!"

আমি বল্লুম—"তা পারব। আমার অ্যাড্ভেঞ্চার করা অভ্যেস আছে।"

আর বিশেষ কিছু কথা হল না। রাত তখন কটা জানি না। আমাদের ট্রেন এসে রাহাকোটে পৌঁছল। আমরা দু-জনে নেমে পড়লুম। অপর সকলে অজ্ঞানের মতো ঘুমচ্ছেন।

টিনের ছাউনি দেওয়া ষ্টেশান—একটা প্ল্যাটফরম পর্য্যন্ত নেই। আমার হাত ধরে টানতে টানতে সাধুজী মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লেন; সামনে একটা প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মতো বতুঙ্গ পাহাড়টা চোখে পড়ল। মেঠো আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে আমরা চল্লুম। আমার মনে হল সাধুজী আমার হাত ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। টপাটপ ক্ষেতের পর ক্ষেত আমরা পার হতে লাগলুম। লাফাতে লাফাতে আমরা চলেছি—যেন বাতাসের আগে যাচ্ছি।

এমনি করে বতুঙ্গ পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়ালুম। পাহাড়ের তলাটা ঘোরতর অন্ধকার—ঠিক যেন, কালো বাতাস জমাট বেঁধে রয়েছে। সাধুজী একটা গাছের ডাল ভেঙে মশাল জ্বালালেন। তারপর দু-জনের কোমরে দুটো লতা বাঁধলেন। অসম্ভব রকম খাড়াই পাহাড়—

তাতে ওঠে কার সাধ্য। সাধু একটি সুঁড়ি পথ বার করেছেন। আমি একটা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করে নিয়েছি। অন্ধকারের মধ্যে এই লাঠিটিই আমার সম্বল। নইলে একবার পা পিছললে কোথায় যে তলিয়ে যাবো, হয়ত আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু খানিক দূর উঠে সেই সুঁড়ি রাস্তা গেল ফুরিয়ে। আমাদের মাথার উপর দুটো প্রকাণ্ড পাথর ছাদের মতো ঝুলে রয়েছে তার আশ পাশে কোথাও কোন রাস্তা নেই। আমি ভাবলুম—বাস্। এত কষ্ট করে আসা বুঝি বৃথা হল।

সাধুজী বল্লেন—"এই দুটো পাথরের মাঝখানে একটা বড় ফাটল আছে। কিন্তু শুকনো শেওলা জমে প্রায়ই তা বুজে যায়।"

আমি বল্লুম—"কিন্তু কি উপায়ে সে পথ পরিস্কার করবেন ?"

সাধুজী মশালটা নিয়ে গিয়ে দুই পাথরের জোড়ার মুখে ধরলেন। খানিক বাদে দাউ দাউ করে সেটা জ্বলে উঠল। আমরা সরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখতে দেখতে সমস্ত ফাটলটা পরিস্কার হয়ে গেল। পাথরটাকে একটু ঠাণ্ডা হতে দিয়ে সাধু-জী ফাটলের ভিতর দিয়ে লতার ফাঁস ছুঁড়লেন। একটা মুড়ো গাছের গুড়িতে ফাঁস আট-

কালো। তাই ধরে আমরা দু-জনে উপরে উঠে পড়লুম।

এইবার আরম্ভ হল খাড়া খাড়া উঁচু উঁচু ছুঁচোলো পাথরের শ্রেণী। এখানে পায়ে হেঁটে ওঠা যায় না। প্রায় সারা পথই লতার ফাঁস ফেলে ঝুলতে ঝুলতে উঠতে হয়। এমনি ভাবে উঠছি তো উঠছিই—অনেক পথ উঠলুম।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা ঝরণার শব্দ শুনতে পেলুম। শুনে তেষ্টা আরও চেগে উঠল। বল্লুম—"সাধুজী, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাওয়াতে পারেন?"

সাধুজী বল্লেন—"এইটুকু উঠেই তেষ্টা পেয়ে গেল? চল না আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তো ফোয়ারার কাছে পৌঁছব—সেখানে পেট ভরে খেও।"

তাইত, আমি বাবুই, সাধুজীর কাছে শেষটা এত খেলো হয়ে যাবো? সাধুজী ভাবলেন এইটুকু উঠেই আমার তেষ্টা পেল? আমি বল্লুম—"সাধুজী, সামান্য একটু তেষ্টা পেলেই জল খাবার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করবে সে-ছেলে এ বাবুই নয়। সেই ঈশ্বরদি ষ্টেশান থেকেই আমার তেষ্টা পেয়েছে। এক জায়গায় এক ঢোকমাত্র সোডা খেয়ে বাকিটা ফেলে দিয়ে এসেছি। তারপর এই ছুটোছুটি এই পরিশ্রম। নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে বলেই বলছি। আর এই যে কাছেই একটা জলের শব্দ

শোনা যাচ্ছে। এ না হলে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হত না।”

সাধুজী বল্লেন—“বেশ চল কাছেই একটা ঝরণা আছে বটে, মিনিট দশের পথ। কিন্তু সাবধান, পথটা বড় খারাপ।”

খানিকদূর গিয়েই একটা প্রকাণ্ড ঢালু পাথর। সেখানে গাছ পালা কিচ্ছু নেই। নেড়া পাহাড়টা ঢালু হয়ে মাঠ পর্য্যন্ত নেমে গেছে, এখানে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে ওঠে। ওঃ, অনেকটা উঁচুতে আমরা উঠে পড়েছি তো। বহুদূরে লোকালয়ের আলো মিটমিটে প্রদীপের মতো চোখে পড়ল। সাধুজী বল্লেন, ওটা একটা লোহার কারখানার আগুন প্রকাণ্ড আগুন, এখান থেকে ঐরকম দেখাচ্ছে।

অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা চলতে লাগলুম। ক্রমে ঝরণার কাছে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু সে জায়গাটায় হাত বাড়িয়ে ঝরণার জল পাওয়া যায় না—অনেক নীচে দিয়ে ঝরণার জল বইছে। ঝরণায় নামবারও উপায় নেই—চারিদিক অত্যন্ত পিছল। সাধুজী বল্লেন—“চল একটু উপর দিকে উঠে দেখা যাক্।”

ঢালু পাহাড় ধরে আমরা উপরে উঠতে লাগলুম। খানিকদূরে গিয়ে দেখি একজায়গায় কয়েকটা বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে রয়েছে। সাধুজী বল্লেন—দিন

কতক আগে খানিকটা পাহাড় ধ্বসে গিয়েছিল, তারই ফলে এই সব গাছ আর বড় বড় পাথর খসে পড়েছে। একটা গাছ ডালপালা শুদ্ধ ঝরণার উপর পড়েছিল। সেই গাছ বেয়ে গিয়ে আমি প্রাণভরে ঠাণ্ডা জল খেলুম।

তারপর ফিরে এসে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লুম—"সাধুজী, সত্যিই এতদিনে আমার একটা সত্যি-কারের অ্যাড্ভেঞ্চার হচ্ছে। আমার অনেক দিনকার সখ এইবার মিটল।"

বলে নীচু হয়ে সাধুর পায়ের ধূলো মাথায় নিলুম। সবে মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় মাথার কাছে একটা গুড় গুড় গুড় গুড় শব্দ শোনা গেল। সাধুজী লাফিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন—"ল্যাণ্ডশ্লিপ্।"

আমি বল্লুম—"ল্যাণ্ডশ্লিপ্ কি ?"

সাধুজী বল্লেন—"উপরে পাহাড় ধ্বসে পড়েছে। শিগ্গীর কোথাও আড়াল নাও, এখনি এখানে এসে পড়তে পারে।"

আমি তাড়াতাড়ি একটা উপড়োনো গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোলুম। সাধুজী একটা ডালে চড়ে বসেছিলেন। আমায় বল্লেন—"লতাটা দিয়ে একটা ডালের সঙ্গে কোমর বেঁধে ফেল। নইলে ছিটকে ফেলে দেবে।"

আমি একটা মোটা ডালের সঙ্গে লতা জড়িয়ে নিজেকে বেঁধে ফেল্লুম।

সঙ্গে সঙ্গে কিসের একটা ধাক্কা এসে লাগল। ধুলোয় বালিতে চারিদিক ঢেকে গেল। আর কিছুই দেখতে পেলুম না—কেবল বুঝলুম যে গাছ পালা পাথর ধুলো মাটি সবশুদ্ধ নিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নেমে চলেছি। তারপরই আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। হুড় মুড় করে বড় বড় পাথর গড়িয়ে এসে আমার গাছটাকে পিষে গুঁড়ো করে দিলে। আমি যে ডালটায় বাঁধা ছিলুম সেটা ভেঙে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে একদিকে ছিটকে গেল। পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে আমি পড়লুম। মনে হল যেন আমার হাত পা মাথা সমস্ত গুঁড়িয়ে গেছে। আমার যেন নড়বার চড়বার কথা বলবার আর কোন ক্ষমতা নেই।

এমনি অবস্থায় কতক্ষণ পড়েছিলুম জানি না। খানিক পরে টের পেলুম আওয়াজ টাওয়াজ সব থেমে গেছে। চেঁচিয়ে ডাকলুম—"সাধুজী।" কিন্তু কোন সাড়া পেলুম না। "সাধুজী—সাধুজী" বলে চীৎকার করতে লাগলুম। চারিদিক নিস্তব্ধ। এই অন্ধকারের মধ্যে সাধুজীকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। চুলোয় যাক সাধুজী, নিজে এখন কোথায় এসে পড়েছি তাই বা বলে কে?

গাছের ডাল থেকে নিজের বাঁধনটা খুলে ফেল্লুম। কোথাও চোট পাইনি দেখলুম—তবে ছড়ে টড়ে গেছে কিনা অন্ধকারে টের পেলুম না। গাছপালা পাথরের

স্তূপ পার হয়ে একটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। দেখি কিছুদূরে একটা সবুজ আলো জ্বলছে।

তখন বুঝলুম যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে একেবারে জমিতে এসে পড়েছি।

সবুজ আলোটা লক্ষ্য করে চলতে লাগলুম। মাইল খানেক পথ চলবার পর সেখানে পৌঁছে দেখি একটা রেলওয়ে সিগন্যাল। সিগন্যাল যখন আছে তখন কাছেই ষ্টেশানও আছে। এই ভেবে রেলের লাইন ধরে চলতে লাগলুম। কিছু দূরে গিয়েই ষ্টেশান মিলল। সেই রাহাকোট ষ্টেশান।

একটা কুলিকে জিজ্ঞেস করলুম—"সিগন্যাল দিয়েছে, কোন গাড়ি আসছে ?"

সে বল্লে, দার্জ্জিলিং মেল চার নম্বর স্পেশাল।

চার নং স্পেশাল এসে পৌঁছতেই আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা খুলে উঠে পড়লুম। কামরার মধ্যে কেউ ছিল না। হাত পা ছড়িয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। ভাবতে লাগলুম, এই অ্যাড্‌ভেঞ্চারটার কথা কি রকম ফলাও করে সকলের কাছে গল্প করতে পারব। এইবার সকলকে মানতেই হবে যে হাঁ এতদিনে বাবুই একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার করলে বটে! ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। তারপর একেবারে সেই ভোর বেলা শিলিগুড়ি ষ্টেশানে ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভেঙে দেখি পাঁচ ছ'জন ভদ্রলোক গাড়ির মধ্যে উঠে খুব আস্ফালন করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলছেন—"কি আশ্চর্য্য! দেখুন ব্যাটা কারো জিনিস পত্র নিয়ে গেল কি না।"

কি ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলুম—"কি হয়েছে কি ?"

তাঁরা বল্লেন—"একজন সন্ন্যাসী না কে কামরার মধ্যে বসে ছিল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি। এইমাত্র সে নেমে চলে যাচ্ছে। ব্যাটা চোর কি বাটপাড় তার বিশ্বাস কি ?"

সন্ন্যাসী!—"কোথায় সন্ন্যাসী ?" বলে আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালুম। একজন দেখিয়ে দিলেন, প্ল্যাট-ফরম পার হয়ে এক জটাওয়ালা সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছে।